দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ২য় সংখ্যা ❖ ২ জুন ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল ২
- যুদ্ধোন্মাদনা ও দেশপ্রেম ৩
- এলোমেলো কথা : স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত নেহরু ৫
- আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ৬
- বাংলাদেশ ইসলামি মৌলবাদীদের কোলে বসে হাত-পা ছুঁড়ছেন মহম্মদ ইউনুস ৭
- বুকার জয়ী বানু মুশতাকের গল্প : আসলে নারীর লড়াইয়ের বয়ান ৯
- 'রক্তকরবী' প্রদীপের শিখা ও ছাই-এর গল্প ১০
- নাগরিক স্মৃতিচারণা : লায়লা কবির : এক সাহসিনী বাঙালি নারী ১৬
- ডি.এ.মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সারা দেশের কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জয় ১৭
- পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি কিন্তু মাথাপিছু আয়ে স্থান একশো তেতাল্লিশতম ১৯
- মাই নেম ইজ খান: 'নতুন' ভারতে ন্যায়বিচার কোথায়? ২১
- পুরনো লেখা ফিরে পড়া : কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা ২২

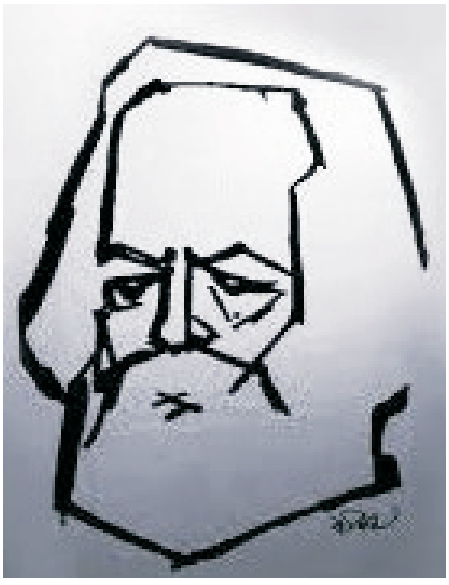

➲সম্পাদকীয়

প্রধান লক্ষ্য যুদ্ধের বাতাবরণ ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন বজায় রাখা

ভারতীয় সময় শুক্রবার ৩০ মে গভীর রাতে ওভাল অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারও বলেছেন যে তাঁর দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতি করতেবাধ্য করেছে, নইলে এই যুদ্ধ পারমাণবিক বিপর্যয়ের দিকে চলে যাচ্ছিল " আমরা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলেছি এবং জানিয়ে দিয়েছি যারা একে অপরকে গুলি করছে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করা সম্ভব নয়।" আমরা অনেককে যুদ্ধ থেকে বিরত করেছি , কারণ আমাদের থেকে ভালো যুদ্ধ কেউ করতে পারবেনা।" ট্রাম্প-- এর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী মোদী যথারীতি অখণ্ড নীরবতা পালন করছেন। কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন 'গত ২১ দিনে ট্রাম্প ১৩ বার দাবি করেছেন তাঁর হস্তক্ষেপে যুদ্ধথেমেছে ' মোদীজি আর কবে মুখ খুলবেন ! মোদী সরকারের বিদেশ মন্ত্রী জয়শংকর, বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি সকলেই নিশ্চুপ। কিন্তু দেশের জনগণকে বোঝাতে হবে তিনি কত বড় উগ্র রাষ্ট্র ভক্ত । তাঁকে উগ্র জাতীয়তাবাদী বাগাড়মবর চালিয়েযেতে হবে । তাই তিনি শুরু করেছেন বিভিন্ন রাজ্যে রোডশো। তিনি সেই সব রাজ্যেযাচ্ছেন যেখানে সামনে নির্বাচন ও সীমান্তথেকে নিরাপদ দূরত্বেঅবস্থিত গো-বলয়ের বিজেপি শাসিত রাজ্য । যেমন বিহার , পশ্চিমবঙ্গ , গুজরাত , মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য। না তিনি পহেলগাও বা পুঞ্চ যাননি । যেখানে জঙ্গী হামলার বা পাক গোলার ক্ষত দৃশ্যমান। সেখানে গিয়েছেন রাহুল গান্ধি। না মোদী মণিপুরেও যাননি । তিনি বলছেন তাঁর শরীর দিয়ে নাকি রক্ত নয় গরম সিঁদুর বয়ে যাচ্ছে। কখনও পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে হিন্দি ফিল্ম 'শোলে'-র ভিলেন গববর সিং এর সংলাপ বলছেন ' আবতো গুলি খা ।' কিন্তু এতোই যদি বীরত্ব তাহলে ট্রাম্প - এর ধমক খেয়ে যুদ্ধ বন্ধ করলেন কেনো মোদী ?. কেনো তিনি কখনও ট্রাম্প ও চিনের সম্পর্কে একটা কথাও বলেননা ? ভয়ে ? বিদেশে বিভিন্ন দেশেকেনোগেলেন না মোদী ? সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হবেবলে ? এমনিতেতো তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। দেশের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীকেছেড়েরেখেছেন জ্জ এই শক্তি পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় নিহত পর্যটকনৌসেনারলেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী তাঁরস্বামীর মৃত্যুর জন্য কাশ্মীরের মানুষ অথবা মুসলমানদের দায়ী করতে চাননি। এজন্য তাঁকে সমাজ মাধ্যমে সাংঘাতিক ট্রোল করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বিজেপির মন্ত্রী বিজয় কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে গালাগালি করেছে। তার কিচ্ছু হয়নি । উল্টে বরোদায় মোদীর রোডশোর সময়ে কর্নেল সোফিয়ার পরিবারের সদস্যদের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে হয়েছে। বিজেপির এক এম. পি রামচন্দ্রবলেছেপহেলগাঁওতে মহিলারারানী অহল্যাবাই ও ঝাসিররানী লক্ষী.বাই এর মতন সাহস দেখাতে. পারেনি. বলে এত জন নিহত হলেন। মোদীজি এই এমপি কে কিচ্ছু বলেননি। সিঁদুর- এর মর্যাদা. রক্ষিত হল ?

আলিপুরদুয়ারে মোদীর জনসভা থেকে ঘোষণা করা হয়েছে 'অপারেশন পশ্চিমবঙ্গ।' আর কলকাতায় অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন. বহুব্যবহারে জীর্ণ অনুপ্রবেশ তত্ব। অর্থাৎ যুদ্ধের বাতাবরণ বজায়রাখা ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটানো , এই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রধান রণকৌশল।

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল...

সৌর বসু

ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিকতম যুদ্ধ অবসানের পর উভয় রাষ্ট্রীয় দাবি করছে যে ,তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। ভারতের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত লস্কর-ই-তৈবা, জইস-ই-মহম্মদ, প্রমুখ জঙ্গি গোষ্ঠীর শিবির গুলি ধ্বংস করা। ভারত সরকার দাবি করছে যে সন্ত্রাস বাদী শিবির উড়িয়ে দিতে তারা সক্ষম হয়েছে। এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তাছাড়া ইতিপূর্বেও সন্ত্রাসবাদীদের শিবিরের উপর আক্রমণ হয়েছে। অনেক সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ হয় নি।

নরেন্দ্র মোদি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে দেশব্যাপী প্রচার চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার করে জনগণের মধ্যে নিজের প্রবল পরাক্রমশালী ভাবমূর্তি স্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে অপারেশন সিঁদুর মোদির নির্বাচনের জয়লাভ করার অস্ত্র হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ বিরতির পর ভারতের যেসব জায়গায় তিনি ভাষণ দিয়েছেন সেখানেই তিনি অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে বড় বড় কথা বলেছেন। সম্প্রতি তিনি পাকিস্তানকে হুমকি দিয়ে বলেছেন যে ' হয় রুটি খাও নয় গুলি খাও।' মোদী বিখ্যাত 'শোলে ' চলচ্চিত্রের খলনায়ক গব্বর সিং- এর সংলাপ ব্যবহার করেছেন জ্জ কোনও সভ্য দেশের প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের বর্বরোচিত ভাষা ব্যবহার করতে পারে , তা সভ্য সমাজের কল্পনার অতীত, ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

এবারের যুদ্ধ ছিল চার দিনের। একে হয়তো ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না। কিন্তু দুটি পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্রের মধ্যে এই ধরনের সামরিক বিবাদের পরিণতি ভয়ংকর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের ফলে এবার যুদ্ধবিরতি স্থাপিত হয়। ১৯৭১ এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয় এবং ১৯৭২ সালে শিমলাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে দুটো দেশ মতবিরোধ নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুত । লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক বলেছেন যে ভারত দ্বি পাক্ষিক আলোচনার পরিবর্তে অন্য দেশের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানের বক্তব্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনা দুটি রাষ্ট্রের মতবিরোধ মীমাংসার অন্যতম উপায় নয়, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সমস্যা নিরসনের জন্য যে প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তা প্রমাণ করলো। ডিপ্লোম্যাট পত্রিকার দক্ষিণ এশিয়ার সম্পাদক সুধা রামচন্দ্রনের মতে এই যুদ্ধের ফলে নরেন্দ্র মোদি তার উগ্র জাতীয়তাবাদী সমর্থকদের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। তৎসত্ত্বেও মনে হয় তৃতীয় পক্ষের আবেদনে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ বিরতি মেনে নেওয়ায়, উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে অস্বস্তির মধ্যেই রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখন যুদ্ধ চলছে। ইসরাইল নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে শিশু এবং মহিলা সহ নিরাপরাধ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে চলেছে। গাজা ভূখণ্ড অধিকার না করা পর্যন্ত ইসরাইল যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে হুংকার ছেড়েছে। পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধে লেবানন , সিরিয়া , ইরান জড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের মীমাংসা কবে হবে তাও অজানা। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মায়ানমারের অস্তিত্ব বিলোপের পথে। বাংলাদেশ ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়িয়ে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শুল্কযুদ্ধ। আমেরিকার অর্ধোন্মাদ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দেশকে বিশ্বসেরা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছেন, যার পরিণতিতে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

বিংশ শতাধী দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। মানব সভ্যতা ধ্বংসের কিনারায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এদের নিদান আজ আর কার্যকরী হয় না। দুটো বিশ্বযুদ্ধের থেকে মানব সভ্যতা শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তাই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত যুদ্ধে বিদীর্ণ হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বে সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ২০২৪ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৭০১৮ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সামরিক ব্যয় ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক বাহিনীর পিছনে পাঁচটি রাষ্ট্র সর্বপেক্ষা ব্যয় নির্বাহ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, রাশিয়া, জার্মানি এবং ভারত রাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়, সমগ্র দুনিয়ার সামরিক ব্যয়ের ষাট শতাংশ। পাকিস্তান সামরিক খাতে ২০২৪ সালে ৭.৬ বিলিয়ন ডলার এবং ভারত ২০২৪ সালে সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ব্যাপক দারিদ্র সত্বেও ভারত এবং পাকিস্তানের মতো দুটি গরীব দেশ সামরিক খাতে বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করে চলেছে। এই সামরিক ব্যয় দুটি দেশকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ।

ভারত এবং পাকিস্তানের সম্মিলিত জনসংখ্যা ১.৬ বিলিয়নেরও বেশি। ভারতের ২৮% জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে, অর্থাৎ তাদের দৈনিক আয় ৩.৬৫ ডলারের বেশি নয়। পাকিস্তানি ৪২% মানুষ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ২০২৫ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুসারে ভারতের স্থান বিশ্বের দেশ গুলির মধ্যে ১৩০ তম। যে তিনটি সূচকের ভিত্তিতে মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় , অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক বৈষম্য, তিনটি ক্ষেত্রেই ভারত অন্যান্য দেশগুলির থেকে অনেক পিছিয়ে। সমগ্র বিশ্বের ১৯৩ টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়ন রিপোর্টে পাকিস্তানের স্থান ১৬৮ তম।

ভারত পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দুটি দেশে , দরিদ্র মানুষের মুখের অন্নর পরিবর্তে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়, দেশের অন্তরাত্মাকে অপমানে বিদ্ধ করছে। বর্তমানে উগ্র জাতীয়তাবাদী দল ভারত শাসন করছে। ধর্মকে

ভিত্তি করে দেশকে বিভাজিত করার নির্মম প্রয়াস চলছে। মুসলমান, খ্রিস্টানদের নাগরিক অধিকার আজ বিপন্ন। ভারতের একমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য থেকে অগণতান্ত্রিক উপায় তাদের রক্ষাকবচ ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ বিলোপ করা হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকা আজ সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবৃত। কাশ্মীরে নতুন সরকার গঠিত হলেও, আইনশৃঙ্খলা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বর্তমানে বিবাদে পরিপূর্ণ। অর্থনীতিও জরাগ্রস্ত। সেনাবাহিনী সর্বাধিনায়ক পাকিস্তানের মানুষকে দ্বিজাতি তত্ত্বের বাণী শোনাচ্ছেন। দুটি দেশ উগ্র জাতীয়তাবাদী জ্বরে আক্রান্ত। উগ্র জাতীয়তাবাদ শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করেছে। দুটো পরমাণু শক্তিধর দেশ উগ্র জাতীয়তাবাদের মোহজাল যদি ছিন্ন করতে না পারে, তাহলে এর ভবিষ্যৎ পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

যুদ্ধোন্মাদনা ও দেশপ্রেম

মজিবুর রহমান

২২শে এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর ৭ই মে ভারতের বায়ুসেনা পাকিস্তানের বিভিন্ন জঙ্গি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। এই সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর'। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রত্যুত্তর দেয়। ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হয়। ১০ই মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। যুদ্ধবিরতি নিয়ে অনেকেই সমাজ মাধ্যমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আবার, যুদ্ধের বিরোধিতা করেও বহু মানুষ পথে নামেন। যুদ্ধ বিরোধীরা যুদ্ধ বিরতির বিরোধীদের রোষানলে পড়েন। যুদ্ধ বিরোধীদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং তাদের দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হয়। এই ঘটনাক্রমের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ ও দেশপ্রেমের স্বরূপ সন্ধান প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সকল দেশের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের একটি প্রিয় স্লোগান হল 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। সুস্থ চিন্তাভাবনার মানুষেরা যুদ্ধের জয়গান গাইতে পারেন না। দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত কখনও কাম্য নয় কারণ যুদ্ধ সবসময়ই ধ্বংসাত্মক। যুদ্ধ মানেই সামরিক ও বেসামরিক মানুষের মৃত্যু এবং বিপুল সম্পদহানি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় হয় প্রচুর অর্থ। যুদ্ধ নিশ্চিতভাবেই উন্নয়ন বিরোধী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান প্রভৃতি জনহিতকর খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করে প্রতিরক্ষা খাতের স্ফীতি ঘটানো হয়। এজন্য আলাপ-আলোচনা বা নেগোসিয়েশনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সামরিক সংঘর্ষের কথা ভাবা যেতে পারে; তার আগে নয়। অথচ এই মুহূর্তে ভারত-পাক যুদ্ধকে কিছু মানুষ বিনোদনের দৃষ্টিতে দেখছে। যুদ্ধে ভারতের প্রাথমিক সাফল্যে অতি উৎসাহী হয়ে তারা যুদ্ধবিরতির বিরোধিতা করছে। সাংবাদিক বৈঠকে যুদ্ধবিরতির সরকারি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রী সপরিবারে সমাজ মাধ্যমের কুৎসিত আক্রমণের শিকার হয়েছেন। ভারতের সংবিধান ও সেনাবাহিনীর সেক্যুলার চরিত্রের কথা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার জন্য স্থলবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং একই রকম কুকথার সম্মুখীন হয়েছেন। মেনস্ট্রিম মিডিয়া সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় যুদ্ধোন্মাদনা দেখে বিরক্ত হয়ে প্রাক্তন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ নারাভানে বলেছেন, 'যুদ্ধ নিয়ে রোমান্টিসিজম বন্ধ করুন। এটা বলিউড সিনেমা নয়।' বর্তমান সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদীও যুদ্ধ নিয়ে উল্লাস করতে বারণ করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'প্রোগ্রেস' নাটকে যুদ্ধে সন্তানের মৃত্যু এবং সন্তানের শোকে স্বামীর মৃত্যুতে মিসেস মেল্ডনকে যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে দেখা যায়। তিনি তাঁর ভাই প্রফেসর কোরীকে, যিনি যুদ্ধকে আরও ধ্বংসাত্মক করার জন্য বোমা তৈরির ফর্মূলা আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন, ছুরি মেরে হত্যা করেন। জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর 'আর্মস এ্যান্ড দ্য ম্যান'-এ যুদ্ধকে মহিমান্বিত করার কোনো কারণ দেখেননি। পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় নিহত পর্যটক নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য কাশ্মীরের মানুষ অথবা মুসলমানদের দায়ী করতে চাননি। এজন্য তাঁকে সমাজ মাধ্যমে সাংঘাতিক ট্রোল করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে প্রাণ হারান ক্যাপ্টেন মনদীপ সিং। তখন তাঁর কন্যা গুরমেহরের বয়স ছিল দুই বছর। ২০১৭ সালে কলেজে পড়াশোনা করার সময় তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আমার বাবাকে হত্যা করেনি। যুদ্ধ তাঁকে খুন করেছে।' এই উপলব্ধি প্রকাশ করার কারণে গুরমেহরকে হিন্দুত্ববাদীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটূক্তি ও ধর্ষণের হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। যারা ভুক্তভোগী যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের মনোভাব প্রায় একই। কোনো শহিদ পরিবার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ অথবা সৈনিকের মৃত্যুর মধ্যে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। একজন সৈনিককে যতই দেশমাতৃকার বীর সাহসী সন্তান বলে উল্লেখ করা হোক না কেন, পরিবারের কাছে সে একজন 'আর্নিং মেম্বার' মাত্র; সরকারি চাকরিজীবী। মাস্টার, ডাক্তার, উকিল, অফিসার, করণিক হওয়ার সুযোগ ত্যাগ করে কেউ সৈনিক হওয়ার সাধ পূরণ করে না। উচ্চবিত্ত বা শিল্পপতিদের পরিবারের সন্তানদের সাধারণত সামরিক বাহিনীর সদস্য হতে দেখা যায় না। কেউই চায় না যুদ্ধে মিসাইল বা মারণাস্ত্রের মুখে পড়তে; ক্যানন ফডার বা কামানের খাদ্য হতে। যে মন্ত্রী-সান্ত্রীরা ঠাণ্ডা ঘরে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করেন আর যারা বাড়িতে বসে বোকা বাক্সে যুদ্ধের ধারাবিবরণী শোনেন তাদেরকে কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করে না। তাই তারা দুটি দেশের সামরিক সংঘর্ষকে দুটি দলের টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট ভাবতে পারেন।

দেশপ্রেম (প্যাট্রিওটিজম) হল নিজের দেশের প্রতি গভীর ভক্তি, ভালোবাসা ও একাত্মতার অনুভূতি। দেশপ্রেম নাগরিককে দেশের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সর্বোপরি স্বদেশবাসীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার মানসিক প্রবৃত্তিও দেশপ্রেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আইন মেনে চলা, ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা, কর প্রদান করাও একজন দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। দেশপ্রেম সহনাগরিকের সঙ্গে একটা সংযুক্তিবোধ তৈরি করে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। অবশ্য দেশপ্রেমের আধিক্য অর্থাৎ জিংগোইজম বা শৌভিনবাদ এক বিষম বস্তু। অযৌক্তিক আবেগ ক্ষতিকর।

দেশ আর দেশের সরকার কিন্তু এক নয়। দেশপ্রেম জন্মগত ব্যাপার কিন্তু সরকার গঠিত হয় একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ প্রায় সকলেই দেশপ্রেমিক কিন্তু অর্ধেকের বেশি দেশবাসী সরকারের সমর্থক নাও হতে পারে। দেশপ্রেমের প্রদর্শন আর সরকারকে সমর্থন একসাথে নাও ঘটতে পারে। দেশপ্রেমিক নাগরিকবৃন্দ প্রায় সকলেই দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু সরকারের প্রতি এই শ্রদ্ধা নাও থাকতে পারে। সরকার বা শাসকদল জোরপূর্বক নাগরিকদের দেশপ্রেম পরীক্ষা বা বিচার করার দায়িত্ব নিলে গোল বাধে।

দেশপ্রেম প্রদর্শনের কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ নেই। অহিংসার পথে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে আশাবাদী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যেমন দেশপ্রেমিক ছিলেন তেমনি দেশপ্রেমিক ছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী ভগৎ সিং। স্বদেশপ্রেমের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশবাসীর প্রতি তীব্র ভালোবাসা থেকেই সেই বয়কটের বিরোধিতা করেন। বিশিষ্ট মার্কিন চিন্তাবিদ নোয়াম চমস্কি আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির কট্টর সমালোচক। কিন্তু তিনি দেশদ্রোহী নন বরং 'আমেরিকার বিবেক' বলে পরিচিত।

ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকদের প্রশ্ন করার পূর্ণ অধিকার আছে। সরকার বা শাসককে প্রশ্নবিদ্ধ করার সঙ্গে দেশপ্রেমের কোনো সংঘাত নেই। বরং দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে শাসক তার নিজের স্বার্থে দেশকে পরিচালনা করতে চাইলে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের সাথে সরকারের বিরোধ বাধে। সংবিধানে কোথাও যুক্তিবোধকে বিসর্জন দেবার কথা বলা হয়নি। সেই যুক্তিবোধ থেকেই সাম্প্রতিক পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিহানার ঘটনাকে দেখা দরকার। জঙ্গি অথবা সন্ত্রাসীবাদীরা কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। তাই তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে হাইলাইট করার কোনো মানে হয় না। ধর্মের উদারতার অংশ জঙ্গিদের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু গোঁড়ামির দিকটা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।সন্ত্রাসবাদীরা স্ব-সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদেরহত্যা করতেও দ্বিধা করে না। যেমন, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী আর তাঁর আততায়ী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্য নাথুরাম গডসে দুজনেই হিন্দু ছিলেন। আফগানিস্তান কিংবা পাকিস্তানের জঙ্গিরা মুসলমান আর স্বদেশে তারা যাদের মারে তারাও মুসলমান। এজন্যই বলা হয়, সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না। জঙ্গিরা মৌলবাদী হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তারা মানুষ মারার সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করবে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের অপকর্মের দায় তারা যে ধর্মের মানুষ সেই ধর্মের বাকি মানুষদের উপর বর্তায় না। এই কারণে পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের ধর্ম জেনে মারা হয়েছে বলে যে আখ্যান ছড়িয়েছে তার তেমন তাৎপর্য নেই।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের জনসংখ্যা সোয়া এক কোটি। উপত্যকায় সেনা মোতায়েন রয়েছে আড়াই লাখ। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বাতিল করে উপত্যকাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। পাক-ভারত বর্ডার থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পর্যটন কেন্দ্র হল পহেলগাঁও। বলা হচ্ছে, এখানে ৪-৫ জন জঙ্গি হত্যালীলা চালিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এই জঙ্গিগুলো যদি পাকিস্তান থেকে আসে তবে বর্ডারের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে এতটা পথ অতিক্রম করতে পারল কিভাবে? তাণ্ডব চালানোর সময় তারা ভারতের সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ল না কেন? জঙ্গি হানার শিকার হওয়া মানুষদের উদ্ধার করতে প্রশাসনের অলস ও নির্লিপ্ত ভূমিকার কারণ কী? কোনো সন্তোষজনক উত্তর নেই। হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষীদের নজর এড়িয়ে জঙ্গিদের পক্ষে কি দুশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হতে পারে না। তাহলে তারা ঘটনাস্থলের আশেপাশেই কোথাও আত্মগোপন করেছে। সেক্ষেত্রে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে তাদের ধরে ফেলার কথা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত এই সহজ ও সাধারণ ঘটনাটিও ঘটলো না কেন? ভারতে লুকিয়ে থাকা ৪-৫ জঙ্গিকে ধরা গেল না অথচ পাকিস্তানে অবস্থিত ৯-১০টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে! হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায়! ২০১৯ সালের পুলওয়ামাকাণ্ডের মতোই ২০২৫ সালের পহেলগাঁওকাণ্ডের মধ্যে কোনো গোপন রহস্য রয়েছে। গোদি মিডিয়া সঠিক সংবাদ পরিবেশন করছে না; উল্টে ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে।

ভারতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির যত জনপ্রিয় হয় চীনের বিরুদ্ধে তত হয় না। এর দুটি কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, চীন আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে ভারতের থেকে এগিয়ে। কাজেই চীনের সঙ্গে সংঘর্ষে সুবিধা হবে না। কিন্তু ভারত ভেঙে পয়দা হওয়া পাকিস্তান আর্থিক ও সামরিক শক্তিতে ভারতের থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে। কাজেই পাকিস্তানকে চোখ রাঙানো সহজ। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। সামরিক সংঘাতের আবহে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় যেটা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির জন্য ভীষণ প্রয়োজন। তাই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বেকায়দায় পড়লে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ঘোরানোর দরকার হলে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী

অটলবিহারী বাজপেয়ী অথবা নরেন্দ্র মোদী সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য পাকিস্তানকে আহ্বান জানান। পাকিস্তানের শাসকবর্গও যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় যথেষ্ট আগ্রহী। তাই দুই দেশের সরকারের ইচ্ছায় গোলা বর্ষণ শুরু হয়। সামরিক সংঘাতের আবহে হিন্দুত্ববাদীরা ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানপন্থী বলে দেগে দেয়। এতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ জোরালো হয়। ভোটের রাজনীতিতে বিজেপির লাভ হয়।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির কোনো প্রভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিজেপির আমলে সেটাই ঘটতে দেখা যায়। বিজেপি সরকার দলীয় স্বার্থে দেশকে যুদ্ধে জড়াতেও দ্বিধা করে না। প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের কাজ দেশবাসীর কাছে শাসকদল বা সরকারের এই অপরাজনীতির মুখোশ খুলে দেওয়া। দেশপ্রেমিক হওয়া আর যুদ্ধের সমর্থক হওয়া এক জিনিস নয়। যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং সম্প্রীতি ও শান্তির পক্ষে সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষের সোচ্চার হওয়া কর্তব্য।

(লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

এলেমেলো কথা

স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত নেহরু

শুভ বসু

ফেসবুকে আমার বহু কংগ্রেসি বন্ধু রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে নেহরুর প্রতি হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্টদের গালিগালাজ এর বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না। আমি কস্মিন কালে কংগ্রেসি নই, কিন্তু নেহরুর এবং ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহ্যের স্বপক্ষে মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। হয়তো আমার কংগ্রেসি বন্ধুদের অনেকেই এখন গেরুয়া ধ্বজার নিচে আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রথমত, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের তথা নেহেরু , প্যাটেল এবং আজাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম বিরাট সাফল্য হলো ভারতের সংবিধান প্রণয়ন। একটি বহুজাতিক প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করতে তাঁরা এই সংবিধানে বৈচিত্রের স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে দেশ ভাগের পরেও তাঁরা যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন এটা তার স্বীকৃতি। সেই সঙ্গে আম্বেদকরের সংবিধান প্রণয়নের যে সমিতি তার সভাপতিত্বের ফলে ভারতে যুগ যুগান্ত ধরে যে অস্পৃশ্যতার প্রথা চলে আসছিলো তার বিরুদ্ধে একটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

দ্বিতীয়ত, প্যাটেল, নেহেরু এবং এবং খানিকটা কমিউনিস্টদের দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গর বিরুদ্ধে আন্দোলনের চাপে পরে তাঁদের ভারতের সংবিধানের আওতায় নিয়ে আসেন। কিন্তু দেশীয় রাজন্যবর্গ যাঁদের অধিকাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর খয়ের খাঁ ছিলেন তাদেরকে একটি ভাতা দেয়াও হতো, পরে শ্রীমতি গান্ধী সেই ভাতা বন্ধ করে দেন।

তৃতীয়ত তাঁরা ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এশিয়ার এবং আফ্রিকার বহু দেশ যাঁরা আমাদের সঙ্গে বা অল্প পরে স্বাধীনতা লাভ করেন যেমন ইন্দোনেশিয়া এবং ইজিপ্ট বা ইরাক কেউই গণতন্ত্রের ধার দিয়ে যাননি। পাকিস্তানের কথা বললাম না কিন্তু ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক প্রথা প্রণয়ন করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এটা একটি বিরাট উল্ম্ফন। প্রায় সবাই ভোটাধিকার পান এবং অর্নিত সানি তাঁর গ্রন্থ How India Became Democratic Citizenship and the Making of the Universal Franchise গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে দেখান যে কি ভাবে ভারতের আমলাতন্ত্র ঝাঁপিয়ে পরে ভোটার তালিকা তৈরী করেন এবং নারী ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং প্রায় অবাধ এবং সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন করেন যাতে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসাবে জিতলেও কম্যুনিস্টরা দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। কারচুপি ছিল না তা বলা যাবে না। সে যুগের মাদ্রাস্ প্রেসিডেন্সির বিধান সভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও তাদের সহযোগীরা ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠতার খুব কাছাকাছি কিন্তু তাদের কে রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ সরকার গঠনের সুযোগ দেন নি। পণ্ডিত নেহরুর দৃঢ় মনোভাবের ফলে ভারতে হিন্দু কোড বিল , যাতে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হয়, তা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণ পন্থার অনুসারী শক্তি এবং জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও রাম রাজ্য পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনের একান্ত ভাবে সেকেলে পুরুষতান্ত্রিক ধারণার বিরুদ্ধে তৈরী হয়। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি সেনাপতি আয়ুব খান কিন্তু তাঁর জীবনের সেরা কাজ করেছিলেন Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) পাশ করে জামায়াত প্রভৃতিদের ভ্রুকটু উপেক্ষা করে। আজকের বাংলাদেশে এখনো নারী প্রশ্ন কি রকম সংবেদনশীল সেটা ইউনুস সরকারের নারী বিষয়ক শাসনতান্ত্রিক সংস্করণের প্রশ্নে বোঝা যায়।

ভারতের নেহেরু যুগের আর একটি বিরাট সফলতা হলো ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সুযোগ করে দেয়া। ভাষা মানুষের সামূহিক পরিচয়ের এক বিরাট অংশ। ফলে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে তামিলনাড়ু , মহারাষ্ট্র , গুজরাট ওড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য বিকাশ লাভ করে এবং ভাষা আন্দোলনের ফলে বিহারের মানভূম পুরুলিয়া হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আসে। পরবর্তীকালে আসাম পুনর্গঠনের ফলে নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা , মেঘালয় এবং মিজোরাম প্রভৃতি অঞ্চল রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । নেহেরুর মৃত্যুর অনেক পরে ভারতের মধ্যে জাতি হিসাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের অংশীদারত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত সাত বোন উত্তরপূর্ব অঞ্চলের রাজ্য নিয়ে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে প্রভূত সহানুভূতির প্রকাশ দেখা যায় তাঁরা বোধ হয় অবহিত নন যে অসম থেকে নাগাল্যান্ড সব জায়গায় একটাই উদ্বেগ তাঁদের রাজ্য যেন বাঙালি / বাংলাদেশীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়ে যায়। এবিষয়ে তাঁরা হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে একান্ত ভাবিত নন। মজার বিষয় হলো প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সময়ে অসমে বাঙালি মুসলমান হত্যা করে এঁরাই বাংলাদেশ সরকারের আতিথেয়তা উপভোগ করতেন।

১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতের কৃষি উৎপাদন George Blyn এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছিল একজায়গায় অচল। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে সেই অচলাবস্থা দূর করে কৃষিতে প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। তবে ভারতে একটি ভুলে ধারণা প্রচলিত আছে নেহেরু বা আজাদ এঁরা মার্কিন বিরোধী ছিলেন। একেবারে সত্যি নয়। ভারতে সেই সময় মার্কিনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার , প্রযুক্তিবিদ এবং অর্থনীতিবিদের যাতায়াত ছিল। তাঁদের ভারতে সবুজ বিপ্লব অধি একটি ভূমিকা ছিল। সবুজ বিপ্লবের প্রাক্কালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন ভারতকে যে PL৪৮০ ধারায় অনুদান দিয়েছিলেন তার পরিবর্তে ভারত সেই টাকা ভারতীয় রুপি তে শোধ করে। মার্কিন সরকার সেই রুপি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রথম ছয় টি ভারত তত্ত্ব কেন্দ্র খোলা হয় তার ব্যবস্থা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি নিজেও Syracuse-Cornell বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই রকম একটি কেন্দ্রে ভারত তত্ব পড়িয়েছি এবং আমাকে ফোর্ট ড্রাম এ অবস্থিতি মার্কিন মাউন্টেন রেজিমেন্ট এ আফগানিস্তানের সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস পড়াতে হয়েছিল। আমি অবশ্য তাদের কে বলেছিলাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের PDPA বিরোধিতা তাঁদের সব চাইতে বেশি ক্ষতি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাক স্বাধীনতা এতো বেশি যে সৈন্যরা আমার কথা শুনতেন এবং আমায় ঠাট্টা করে commie প্রফেসর বলতেন। মার্কিন সেনানী মেজর ফিলিপ গ্রান্ট যিনি ছিলেন আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা অভিযানের সরকারি ঐতিহাসিক তিনি আমার কাছেই তাঁর মাস্টার্সের থিসিস করেন। প্রকৃত পক্ষে ভারতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ভাকরা নাঙ্গল পরিকল্পনা সবই মার্কিন টেনেসি ভ্যালি অথরিটির আদর্শে তৈরী হয়।

নেহরুর প্রসঙ্গে এলে বলতে হয় যে ভারতে ১৯৫০ এর দশকে নেহেরু এবং শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে ভারতের IIT এবং বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো তৈরী হয়। ভারতে নেহেরু তাঁর বন্ধু হোমি ভাবাকে দিয়ে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র তৈরী করেন। ভারতের ডিফেন্স ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার এঁদেরই তৈরী করা।

আজকের ভারতের ভাষা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ভারতের মতো বহুজাতিক রাষ্ট্র যে একটি সভ্য রাষ্ট্র হিসাবে একত্রে রয়েছে তার মূলে কিন্তু নেহেরু , প্যাটেল এবং আজাদের নেতৃত্ব। এঁদের কিছু ভুল থাকতে পারে কিন্তু এঁদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে যে খুচরো হিন্দুত্ববাদীরা ফেলে দেবার চেষ্টা করেন তা একান্তভাবে অর্বাচীনের প্রলাপ বলে মনে হয়। আমার মনে হয় সামাজিক মাধ্যমে একথা বলা জরুরী।

আমি নেহেরু সরকারের অন্ধ ভক্ত নই , কিন্তু চাচা নেহরুর ওই সময় অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। আর এই কথাও মনে করে দিতে চাই ভারতের আর এস এস যে প্রথম নিষিদ্ধ করা হয় , তাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল সাহেবই করেছিলেন।

আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী

তসলিমা নাসরিন

একাত্তরে আমার পরিবারের লোক মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আমার পরিবার পাকিস্তানি আর্মি দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। আমি বাহাত্তরের সংবিধানে আস্থা রাখি। আমি শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলে মানি। ধর্মনিরপেক্ষতায়, গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, মানবাধিকারে, এবং নারীর সমানাধিকারে আমি বিশ্বাস করি। আমি যতটা দেশকে ভালবাসি, আমি নিশ্চিত, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, সিপিবি, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ সদস্যই ততটা ভালবাসে না। দেশকে ভালবাসি বলেই দেশের মানুষকে সভ্য শিক্ষিত এবং সচেতন করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, নারীর সমানাধিকারের পক্ষে আমি লেখালেখি করেছি। বই প্রকাশ করেছি। কিন্তু ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, নারীবিদ্বেষী অপশক্তি আমাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল নব্বই দশকের শুরুতে, আমার পাশে তখন কোনও সরকার তো দাঁড়াননি, বরং উল্টে আমার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মামলা করে আমাকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। এরপর না খালেদা জিয়া আমাকে দেশে ফিরতে দিয়েছেন, না হাসিনা দিয়েছেন। খালেদা, হাসিনা দুজনই মানবতার পক্ষে লেখা আমার বইও নিষিদ্ধ করেছেন।

গত জুলাইয়ে আমি কোটা বিরোধী আন্দোলনের সমালোচনা করেছি, কারণ আমি নারীকোটার পক্ষে। আমি চেয়েছি হাসিনা পদত্যাগ করুন, নতুন নির্বাচন দিন। কিন্তু দেশ থেকে তাঁকে বের করে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। আমি কোনও দল করি না, কোনও দল ভাল করলে তার ভাল বলি, খারাপ করলে তার খারাপ বলি। তবে ধর্মভিত্তিক যে কোনও দলের আমি বিরোধী। আমি মত প্রকাশের অধিকারে বিশ্বাসী হয়েও ধর্মের রাজনীতির ঘোর বিরোধী। জামায়াতে ইসলামিকে কোনও রাজনৈতিক দল হিসেবে আমি মানি না। ধর্ম আর রাজনীতি বা ধর্ম আর রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পৃথক করা সভ্যতার প্রথম শর্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।

হাসিনার অসংখ্য ভাল কাজের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁর কিছু খারাপ কাজের সমালোচনা করি। খারাপ কাজের মধ্যে আছে ওলামা লীগ গঠন করা, হেফাজতে ইসলামিকে মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য জমি আর অর্থদান করা, ৫৬০ মডেল মসজিদ বানানো, কওমী মাদ্রাসা গড়া, মাদ্রাসার ডিগ্রি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে সমমানের করা, সিলেবাসের ইসলামীকরণ করা, সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধদের যথেষ্ট নিরাপত্তা না দেওয়া, সম্পূর্ণ বাকস্বাধীনতা এবং প্রেস ফ্রিডম না দেওয়া, হাজার কোটি টাকা লুট করে যে আওয়ামী দুর্নীতিবাজরা পালাচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া, সুষ্ঠু নির্বাচন না দেওয়া ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের মধ্যে এমন প্রচুর লোক ছিল যারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য লীগে যোগ দিয়েছিল, অবশ্যই আমি তাদের বিরোধী। আমি ধিক্কার জানাই সেই আওয়ামী

লীগারদের, যারা দেশে থাকা সত্ত্বেও ছুটে এসে জি হাদিদের হাত থেকে রক্ষা করেনি শেখ মুজিবের ভাস্কর্য, যখন ভাস্কর্যের মাথায় উঠে জি হাদিরা প্রস্রাব করছিল, আর শাবল কুড়োল দিয়ে শুধু একটি নয়, তাঁর সবগুলো ভাস্কর্য ভেঙে ছিল, রক্ষা করেনি শেখ মুজিবের বাড়ি, যখন বুলডোজার এনে বাড়িটি গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, রক্ষা করেনি মুজিব নগরের স্মৃতিসৌধ, স্বাধীনতা জাদুঘর।

যে আওয়ামী লীগাররা এখন জুলাই আন্দোলনে ছিল না বলে গর্ব করছে আর হাসিনার পদত্যাগ বা পতন যারা চেয়েছিল, তাদের নানা ভাবে হেনস্থা করছে, বলতে চাইছে যে হাসিনার পতন হয়েছিল বলে জিহাদি সরকার এসেছে ক্ষমতায়, তাদের বলতে চাই যে, হাসিনা অতি মাত্রায় জিহাদি তৈরিতে সাহায্য করেছিল বলেই জি হাদিতে দেশ ভরে গেছে। আর জিহাদিরা যত ইসলামে বিশ্বাস করেছে, তত নারীবিদ্বেষী হয়েছে, যত নারীবিদ্বেষী হয়েছে তত বিশ্বাস করেছে নারী নেতৃত্ব হারাম। দেশ ইসলামে ভরপুর হয়ে উঠলে নারী আর নেত্রী হতে পারে না, নারীকে ঘরে ফিরে যেতে হয়, ফিরে গিয়ে স্বামী এবং সন্তান- সেবায় ব্যস্ত হতে হয়, ঘর থেকে দু'পা বেরোলে বোরখা নিকাব পরে বেরোতে হয়। শিক্ষা, সচেতনতা আর স্বনির্ভরতাও নারীর জন্য হারাম হয়ে ওঠে। হাসিনা দূরদর্শী ছিলেন না, তাই ইসলামকে কোলের ওপর বসিয়েছিলেন, কওমী মাতা সেজেছিলেন। হাসিনা-পতনের আন্দোলনের নেপথ্য নায়করা সবাই ছিল হাসিনার সাহায্য-সহযোগিতায় গড়ে ওঠা মাদ্রাসা থেকে পয়দা হওয়া জঙ্গি। ইউনুস এই জঙ্গিদের সর্দার হয়েছেন, কিন্তু এই জ ঙ্গিদের পয়দা তিনি করেননি।

এখন যে আওয়ামী লীগাররা ভাবছে, ইউনুসকে হঠিয়ে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনবে, তারাই হাসিনার পদত্যাগ যারা চেয়েছিল তাদের সবচেয়ে বেশি হেনস্থা করছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছে ইউনুস সরকার। জামায়াতে ইসলামী ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আগামী নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ জেতে, আমি খুশি হব। তবে ভোটে জিতে আসা চাই। বছরের পর বছর ক্ষমতার জোরে বিনা নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকা কোনও ভাবেই ভাল কাজ নয়। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নির্বাচনে যেতে ভয় তো লাগবেই। জনগণ থেকে কোনও নেতা নেত্রী যেন বিচ্ছিন্ন না হন। একবার ক্ষমতা হাতে পেলে অনন্ত কাল ক্ষমতায় থাকার স্বপ্নে যেন কেউ বিভোর না থাকেন।

আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে যেভাবে ইউনুসের জঙ্গি বাহিনী নির্যাতন করছে, খুন করছে, জেলে ভরছে, পেটাচ্ছে তার প্রতিবাদ, আমি, দেশে আজ তিরিশ বছর নেই, কোনওদিন ফিরতেও কেউ দেবে না আমাকে, জেনেও, সামান্যতম স্বার্থ নেই আমার, বুঝেও, আওয়ামী লীগের লোক না হয়েও যেভাবে করেছি, সেভাবে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সদস্যই করেনি। ইউনুস সরকারের যত তীব্র সমালোচনা আমি করছি, তত তীব্র সমালোচনা অধিকাংশ আওয়ামী লীগারকে করতে দেখছি না। তাদের অনেকেই ওত পেতে আছে কখন বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, আর সমালোচনায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে এই সরকার বিদেয় নেবে আর হাসিনা ফিরে আসবেন, আর তখনই চলবে তাদের লুটপাট, বিদেশে পালানো, হিন্দুর জমি দখল, দেশ জুড়ে জি হাদি জঙ্গি তৈরির কারখানা মসজিদ মাদ্রাসা বানানো। আমি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নই। আমি মনে করি আওয়ামী লীগকে শুদ্ধ হতে হবে, সৎ হতে হবে,দেশকে ভালবাসতে হবে, ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে রাখতে হবে, রাষ্ট্র এবং সমাজকে ধর্ম থেকে মুক্ত করা শিখতে হবে। একটা সময় তো এমন হয়েছে, কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, সত্য এই যে, জামায়াতে ইসলামি বা হেফাজতে ইসলামির সঙ্গে আওয়ামী লীগের আদর্শগত কোনও পার্থক্য ছিল না।

আওয়ামী নেতাদের চেয়ে এখন বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানই বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা বেশি জানাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনিই বেশি আপসহীন বক্তব্য রাখছেন, তিনিই ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। আসলে দল দেখলে এখন চলবে না। কোনও দলেরই কোনও আদর্শ আর নেই। স্বার্থের জন্য সব আদর্শ বিকিয়ে দিয়েছে সবাই। দল এবং দলের বাইরে কিছু শুধু মানুষ আছে এখনও খাঁটি, এখনও নিঃস্বার্থ। এই মানুষগুলো এক হোক, জোট বাঁধুক। দেশের এই দুরবস্থায় তাদেরই বেশি প্রয়োজন। এখন হায়েনার মতো হিংস্র জিহাদিরা দেশকে চিবিয়ে খাচ্ছে। দেশ এবং দশের ভাল এই খিলাফতিরা কোনওদিন চায়নি। দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে একবার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষেরা গর্জে উঠুক।

বাংলাদেশ ইসলামি মৌলবাদীদের কোলে বসে হাত-পা ছুঁড়ছেন মহম্মদ ইউনুস

মনিরুল হক

কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আজকের আলোচনাটা শুরু করছি।

(১) 'পরিবেশ উপদেষ্টার উপর হামলার নিন্দা জানাই। তবে উনার বোরকা পরা উচিৎ। আজকে তো হামলা হয়েছে। পরবর্তীকালে ধর্ষণের মতো ঘটনাও তো ঘটতে পারে।' বাংলাদেশের পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ান হাসানের উপস্থিতিতে পরিবেশ সংক্রান্ত এক জমায়েতে দুই পক্ষের বিরোধ তথা সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে জামায়েত ইসলামির কর্ণধার শফিকুর রহমান সাহেব রিজওয়ানা ম্যাডামকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

(২) 'এই সরকার ব্যর্থতার দিকে চলে যাচ্ছে...। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম একটি ভালো, ন্যায়ের উপর গড়া দেশ, যেখানে থাকবে সততা, থাকবে আশার আলো। কিন্তু সেই স্বপ্ন এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ।'— আজমেরি হক বাঁধন, আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী জনপ্রিয় বাংলাদেশী অভিনেত্রী। নিশ্চয় সবার মনে আছে, জুলাই অভ্যুত্থানে এই ভদ্রমহিলা মিছিল এবং অবস্থানে সামনে থেকে নেতৃত্ব

দিয়েছিলেন; Iconic ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতার নামী কাগজে আত্মগর্বী প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

(৩) জামাতকে বুকের সাথে আগলে রেখে, রাজাকারের 'বেকসুর খালাসকে' উদযাপন করে আপনারা আমাদের ভোট চান?...। আগামী নির্বাচনে আমি এন সি পি, জামায়াত, এই সমমনা দলগুলিকে ভোট নিজে তো দেবই না, এবং মানুষকে অনুরোধ করব, যেন তারা এই দলগুলি থেকে দূরে থাকে।'– ফরজানা ওয়াহিদ সায়ান। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। ইনি জুলাই আন্দোলনে বুক চিতিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, উদ্দীপক গান গেয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে।

(৪) 'আগামী এক-দুই মাসের মধ্যে ৫০ শতাংশ ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে।' –বাংলাদেশ ব্যবসায়ী সংস্থার সভাপতি'

(৫) 'মহামারীর পর জিডিপি প্রবৃদ্ধি সর্বনিম্ন। এক দশক ধরে ৬% এর উপরে থাকার পর এ বছর প্রবৃদ্ধি ৩.৯৭%।' - বাংলাদেশের জনপ্রিয় দৈনিক 'ডেলি স্টার'।

৬) ' (আমাদের সময়কালে) দেশের ২৭ লক্ষ মানুষ আরও দরিদ্র হয়েছেন, তার মধ্যে ১৮ লক্ষ নারী। আপনি কি আমাকে বৈষম্য বিরোধী শেখাচ্ছেন, নতুন সরকার, যেখানে নারীদের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি পায়' - দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা।

উপরের উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ সকলেই বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থানের অংশীদার। আর বিবৃতিগুলি বিবেচনা করলেই আমরা বুঝতে পারব আজকের বাংলাদেশ কেমন আছে। সে দেশে এখন সামাজিক সম্পর্কের ইসলামিকরণ চলছে ব্যাপকভাবে, রাজনৈতিক পরিসরে কর্তৃত্ব করছে কট্টর ইসলামপন্থা আর অর্থনৈতিক জগৎ চলে যাচ্ছে উৎপাদনহীনতা ও হতাশার অন্ধকারে। রাজনৈতিক আদর্শ কি হবে, কোন অর্থনৈতিক পথে দেশ অগ্রসর হবে সে সব মূখ্য নয়; প্রধান লক্ষ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে ইসলামের ছত্রছায়ায় আনা। হেফাজতে ইসলাম, খেলাফতে ইসলাম, মুসলিম ব্রাদারহুড, হিজবুত তাহরী সহ ২০ টিরও বেশি দল ও গোষ্ঠী এই কাজে ব্যাপৃত আছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জামায়াত ইসলামি ও নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি এই ইসলামিক জোটকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। উপদেষ্টা সরকারের মধ্যে যাঁরা অন্য পথে চলতে অভ্যস্ত তাঁদেরও হেনস্থা করা হচ্ছে। আর অর্থনৈতিক রূপরেখা নিয়ে এঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই, কারণ ইসলামের পথে চললে দেশ এমনিতেই ড্যাং-ড্যেঙিয়ে চলবে। টুকটাক মেরামতের জন্য তো আমেরিকা আছেই।

উপদেষ্টা সরকার দেশের নারীদের উন্নতির রূপরেখা তৈরির জন্য একটা নারী কমিশন তৈরি করেছিল। তা সেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ইসলামিস্টরা। রিপোর্ট গ্রহণ পরের কথা, রিপোর্ট নিয়ে আলোচনাও চলবে না। দাবি - নারী কমিশন বাতিল কর। সরকারপন্থী কিছু নারী সংগঠন সভা করল, এই যা। নারী কমিশন এখন হিমঘরে। নারীদের প্রত্যক্ষ অর্জন যেটা আমরা জানতে পারলাম তা হল দু-জন নারী অধ্যাপকের বদলী, ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের কলেজে। জানা গেল তাঁদের মধ্যে একজন নাদিরা ইয়াসমিন, আন্দোলনকালে যাঁর হাতে 'সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকার চাই' লেখা প্লাকার্ড ছিল। এই অপরাধে তাঁকে নতুন কলেজেও যোগ দিতে দেওয়া হচ্ছে না। অপরজনের অপরাধ তিনি তাঁর ফেসবুকের পাতায় ইজরায়েলকে গণহত্যাকারী বলেও হামাসকেও দায়ী করেছেন প্রথম আক্রমণকারী হিসাবে !

সারা পৃথিবী জুড়ে বিচার ব্যবস্থার কি দৈন্যদশা তা আমরা জানি। সরকার এবং রাষ্ট্র বিচার ব্যবস্থাকে যে চরমভাবে প্রভাবিত করে তার ভুক্তভোগী আমরাও। অপরাধ শিরোমণি শ্রী শ্রী ব্রীজভূষন মহাশয় কিংবা রাম-রহিম বাবারা সহজে জামিন পান, নির্দোষ প্রমাণিত হন বা হবেন , কিন্তু উমর খালিদ বা শার্জিল ইমামরা জামিন তো দূরের কথা, হিয়ারিং -এর সুযোগও পান না। কিন্তু বাংলাদেশের এ টি এম আজহারকে নিয়ে যা হল তার জুড়ি মেলা ভার। ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কুখ্যাত এই খুনি ইউনুস সাহেবদের কৃপায় বেকসুর খালাস পেলেন। মহামান্য আজহার সাহেব ছিলেন রংপুর এলাকার জামায়াত এবং খুনে বাহিনী আল-বদরের নেতা। পাইকারি হারে যে নৃশংসতা তিনি নিজ হাতে ঘটিয়েছিলেন তার গল্প শুনলে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। শুধু একটা তথ্য দিই। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৫ টা অর্থাৎ একদিনে ৫ ঘন্টার মধ্যে রংপুরে ঝাড়ুয়ার বিল ও পদ্মপুকুরে ১২০০ মানুষকে খুন করেন এই আজহার ও তার বাহিনী। ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত এই আল-বদর / জামায়াতের খুনিকে বেকসুর খালাস করার জন্য ইউনুস বাহিনী যে টিম গঠন করেন তার পরিচয়টা একটু দেখুন –

আসামী- আগেই বলেছি, তিনি জামায়াত
প্রসিকিউটর - জামায়াত
সরকারি কৌশলী - জামায়াত
এটর্নি জেনারেল - জামায়াত
প্রধান বিচারপতি - জামায়াত
এমন বিচার, এমন দেশটি, কোথাও খুঁজে পাবে
নাকো তুমি !

২০২৪ এর জুলাইয়ে জেল ভেঙে দাগী অপরাধীদের বের করে আনার যে কাজ শুরু হয়েছিল তা এখনও শেষ হয় নি। গত ১০ মাসে জামায়াত সহ ইসলামিক সন্ত্রাসীরা, বি এন পির সন্ত্রাসীরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে জেল থেকে। দেশে এবং বিদেশে লুকিয়ে থাকা অপরাধীরা নতুন করে সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছে। তারেক জিয়া দেশে থাকাকালীন এবং বিদেশে বসে যে সব অপরাধ মূলক কাজকর্মের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তার সবগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন এবং পুলিশে পাল্লা দিয়ে নিজেদের লোক ঢোকাচ্ছে জামায়াত, বি এন পি এবং নবগঠিত এন সি পি। কোনো আইন বা নিয়ম-কানুনের বালাই নেই, স্রেফ গায়ের জোর। এই গা-জোয়ারী ব্যবস্থা বিগত দশ মাস ধরে চলছে

রাস্তা-ঘাটে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাটে-বাজারে, পাড়া-মহল্লা-শহরে, মসজিদে-মাজারে, শিল্প-কারখানা-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, নাটক-সিনেমা-বইমেলা সহ সমস্ত সাংস্কৃতিক অঙ্গনে।

একে তো দেশের অভ্যন্তরে এই অরাজক অবস্থা, এর উপরে যোগ হয়েছে চিন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারি। বিদেশি বদান্যতা আর খয়রাতিতে NGO চালানো যতোটা সোজা, ঠিক ততোটাই কঠিন বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান মর্যাদা রেখে দেশ চালানো। সারা বিশ্ব দেখছে ডোনাল্ড ট্রাম্প কি যাচ্ছেতাই করে ভারতের বাঘকে ছুঁচো বানিয়ে রেখেছে। সেক্ষেত্রে স্বদেশে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের তকমা পাওয়া মহম্মদ ইউনুস বলবয়ের কাজটাও পাচ্ছেন বলে আমাদের মনে হয়নি।

দেখছি ট্রাম্প প্রশাসন ইউনুস সাহেবের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন কোনো এক খলিলুর রহমানকে যিনি স্বদেশে এক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত হয়ে বেনামে মার্কিন মুলুকে বসবাস করছিলেন বহুদিন ধরে। রোহিঙ্গা সমস্য সমাধানের নাম করে তাঁকে পাঠানো হয়েছে ঢাকা। খুব দ্রুত প্রোমোশন পেয়ে তিনি এখন বাংলাদেশের সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা। এখন জানা যাচ্ছে, মায়ানমারে নিজেদের থাবা শক্তপোক্ত করে বসানোর জন্য বাংলাদেশের স্থলভূমি ব্যবহার করবে মার্কিনরা। যার লোক দেখানো নাম হবে মানবিক/ত্রাণ করিডোর। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেছে গোপন এই পরিকল্পনা। বি এন পি বলছে এই সরকারের কোন অধিকার নেই এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীও প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছে এইরকম করিডোর নীতির তারা বিরোধী। ফলে অভ্যন্তরীণ বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। দেশ হয়ে উঠেছে অস্থির। স্বেচ্ছায় খাঁচায় ঢোকা তোতা ইউনুস বস্তাপচা পুরোনো সেই কথা আবারও একবার উচ্চারণ করে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করলেন, - 'দেশের এই অস্থিরতার জন্য দায়ী ভারত'।

অবশ্য শেখ হাসিনা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, একটি বিদেশি শক্তিকে যদি তিনি দেশের ভূমি ব্যবহার করতে দিতেন তাহলে তাঁর সরকারের পতন হতো না। সুতরাং আমাদের কাছে আবারও পরিস্কার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই পুরোনো খেলাই খেলেছে বাংলাদেশে। মহম্মদ ইউনুস সেই খেলায় সায় দিয়েছেন, তাই তিনি বাংলাদেশে কর্তৃত্ব করার স্বাদ পেয়েছেন।

ক্ষমতা কেমন উপভোগ করছেন সে মহম্মদ ইউনুসই বলতে পারবেন তবে বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষমতার ঘরে বাস করলেও তিনি আসলে আছেন কড়া পাহারায়। এক দরজা পাহারা দিচ্ছে কট্টর ইসলামপন্থীরা তো অপর দরজায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তিনি এখন এই দুই পক্ষের খেলার পুতুল, SOFT TOY. ওরা এখন ইচ্ছেমত ইউনুস সাহেবকে নিয়ে খেলছেন, খেলাচ্ছেন। খেলা ছাড়ার কথা উঠছে না, উঠবেও না। আর তাই তাঁদের আকাঙ্খা যত তীব্রই হোক না কেন, নির্বাচিত কোনো সরকার এখন বাংলাদেশের মানুষ পাবে না।

প্রায় সবাই বলছেন, ইউনুস সাহেবের উচিৎ দ্রুত নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা। তবে মনে রাখতে হবে মার্কিন মদতপুষ্ট এই ইসলামিক মৌলবাদিরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভাবে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা না দিয়ে গণহত্যা শুরু করে।

নির্বাচনের দিন-ক্ষণ নিয়ে নানান কথাবার্তা চলছে। পরিবেশ, উপযুক্ত সময়, আবহাওয়াও বিবেচনার মধ্যে আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাত্র ১৪ মাস পরেই দেশে নির্বাচন সংঘটিত হয়েছিল ৭ মার্চ ১৯৭৩ তারিখে। আর ইউনুস সাহেব সময় চাইছেন অন্তত ২৩ মাস। শুধু মনে মনে তুলনা করুন এখনকার সময়ের সঙ্গে সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া সেই ঝোড়ো সময়ের কথা।

আসলে একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া ইউনুস সাহেবের লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য আওয়ামী লিগকে বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া। আওয়ামী লিগ মানেই ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, যা বাঙালি জাতিসত্বার নব উন্মেষের ধাত্রী। আওয়ামী লিগ মানেই ১৯৭২ এর সংবিধান, যা ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ। আওয়ামী লিগ মানেই প্রগতিশীল ও আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রথম সোপান। আর এই তিনটি বিষয়কেই মৌলবাদী ইসলাম নিজের শত্রু মনে করে। তাই তাদের লক্ষ্য শুধু শেখ হাসিনা নয়, তাদের আসল লক্ষ মুক্তিযুদ্ধ আর সেই মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বন্ধুরা এবং তাঁর প্রিয় দল আওয়ামী লিগ।

১৯৭৫ সালে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামী মৌলবাদ যৌথ অভিযান চালিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ভেবে নিয়েছিল আওয়ামী সংস্কৃতিকে কবরে পাঠিয়েছে জ্জ কিন্তু তারা যে সফল হয় নি, দেশের পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। এখন আবার সময় এসেছে, বাংলাদেশের আপামর মানুষকে বুঝে নিতে হবে তাঁরা কি চান। ইসলামী শাসনের নামে মানব সভ্যতার ফেলে আসা অজর, অনড়, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক মধ্যযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি তাঁদের কাম্য হয় তাহলে এক কথা। আর তা না হয়ে যদি তাঁরা এক আধুনিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক, কুসংস্কার মুক্ত এক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন তাহলে তাঁদের আবারও নামতে হবে এক যুদ্ধে, হয়তো ৭১ এর থেকেও কঠিনতর হবে সে যুদ্ধ।

বুকার জয়ী বানু মুশতাকের গল্প : আসলে নারীর লড়াইয়ের বয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : লেখক, আইনজীবী ও অধিকারকর্মী বানু মুশতাক এ বছর আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার জিতেছেন। ছোটগল্পের সংকলন 'হার্ট ল্যাম্প',এর জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। বানু মুশতাকের

বুকার জয়ের পিছনে রয়েছে সাত দশকের লড়াই। জাতিবাদ, বর্ণবাদ, পুরুষতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা এবং ইসলামের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তিনি লড়ে গেছেন। প্রথমে সাংবাদিক হিসেবে, পরে আইনজীবী হিসেবে। পাশাপাশি চলেছে তাঁর লেখালেখির কাজ। কন্নড় ভাষার এই লেখিকার এখনও পর্যন্ত ছ'টি ছোট গল্প সংকলন, একটি উপন্যাস, একটি প্রবন্ধ সংকলন এবং একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 'হার্ট ল্যাম্প সিলেক্টেড স্টোরিস' বলে যে বইটির জন্য বানু মুশতাক এবং তাঁর অনুবাদক দীপা ভসথি বুকার পেয়েছেন, সেটি একটি ছোট গল্প সংকলন। গল্পগুলি বানু ১৯৯০ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে লিখেছেন। গোটা সময়টি জুড়ে তিনি নিপীড়িত মানুষদের হয়ে ওকালতি করেছেন। আদালতের বাইরে লড়েছেন সমাজকর্মী হিসেবে। মুসলমান মহিলাদের জন্য ছিল তাঁর বিশেষ সহানুভূতি, যার উৎস তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা। এই স্মৃতি এবং মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ 'হার্ট ল্যাম্প'-এর গল্পগুলি জুড়ে রয়েছে।

৭৭ বছর বয়সী বানু মুশতাক কন্নড় ভাষায় লেখালেখি করেন। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাবা তাঁকে কন্নড় মাধ্যম স্কুলেই ভর্তি করেন। কন্নড় ভাষার লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এত বড় পুরস্কার পেলেন। লন্ডনের টেট মডার্ন গ্যালারিতে পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বানু মুশতাক বলেন, 'এ মুহূর্ত যেন আকাশজুড়ে হাজারো জোনাকি একসঙ্গে জ্বলে ওঠার মতো, যা ক্ষণিকের, উজ্জ্বল ও যৌথ প্রচেষ্টাপ্রসূত।' বানু মুশতাক আরও বলেন, 'মহান এই সম্মান আমি কোনো ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করছি না, বরং এমন এক কণ্ঠস্বর হিসেবে গ্রহণ করছি, যা আরও বহু কণ্ঠের সঙ্গে সমবেতভাবে উচ্চারিত হয়েছে।' নামি কন্নড় পত্রিকা 'লঙ্কেশ পত্রিকা'-য় প্রায় বছর দশেক সাংবাদিকতা করলেন মুশতাক। ওই পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন গৌরী লঙ্কেশ, যাঁকে ২০১৭ সালে গুলি করে মারা হয়। এই সময়ে সমাজকর্মী হিসেবে বানু বিভিন্ন বিদ্রোহী সাহিত্যিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'বান্দায়া সাহিত্য'। পরে তিনি পুরসভা নির্বাচনে দাঁড়ান এবং দু'বার জয়ী হন ।

বানু মুশতাকের ছোটগল্পের সংকলন কন্নড় ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন দীপা ভাসতি। গল্প বাছাইয়ে তিনি বানু মুশতাককে সাহায্য করেছেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার পাউন্ড (৬৭ হাজার ডলার), যা অনুবাদক দীপা ভাস্তির সঙ্গে তিনি সমান ভাগ করে নেবেন। 'হার্ট ল্যাম্প'-এ ১২টি গল্প সংকলিত হয়েছে, যেগুলো ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলোতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পগুলোতে বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের অভিজ্ঞতা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানু মুশতাকের গল্পগুলোর পরতে পরতে শুষ্ক ও কোমল রসবোধ, বুদ্ধিদীপ্ত ও কথ্যভাষায় লেখার ভঙ্গি এবং পিতৃতন্ত্র, জাতিভেদ ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার তীব্র সমালোচনা লক্ষ করা যায়। সমালোচকেরা 'হার্ট ল্যাম্প' সংকলনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সংকলনের 'হার্ট ল্যাম্প' গল্পটিতে একটি মুসলিম মহিলাকে তাঁর স্বামী হঠাৎই বাড়িতে ফেলে বেরিয়ে যান নতুন, অল্পবয়সি স্ত্রী আনতে। তাঁর স্বামীর নতুন স্ত্রী চাই আরও বেশি বাচ্চা জন্ম দেওয়ানোর জন্য। তা ছাড়া বিয়ের পণ তো আছেই। মহিলাটি তখন আর থাকতে না পেরে সারা গায়ে কেরোসিন ঢালেন। ঠিক যখন গায়ে আগুন দেবেন তখন তাঁর কিশোরী কন্যা তাঁকে আটকায়। এটা তাঁর নিজের জীবনের গল্প। বানু মুশতাক নারী অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা ও বৈষম্যবিরোধী আইনি লড়াইয়ের জন্য সুপরিচিত।

জুরিবোর্ড বানু মুশতাকের গল্পের প্রাণচঞ্চল দাদিমা থেকে শুরু করে ধর্মীয় নেতাদের চরিত্রগুলোকে 'টিকে থাকার এবং প্রতিরোধের বিস্ময়কর প্রতিচ্ছবি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুষ্ঠানে বানু মুশতাক বলেন, 'আমার গল্পগুলো নারীদের ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি কীভাবে তাঁদের থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করে; তার ফলে কীভাবে নিষ্ঠুরতার শিকার হন তাঁরা; এসব আমি গল্পে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। নারীদের শুধু কারো অধীন রূপেই কীভাবে গড়ে তোলা হয়, গল্পগুলোতে দেখাতে চেয়েছি।' বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ম্যাক্স পোর্টার 'হার্ট ল্যাম্প'কে 'ইংরেজি পাঠকদের জন্য সত্যিকারের নতুন কিছু' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'এটি একটি বিপ্লবাত্মক অনুবাদ, যা ভাষার গতিপথ বদলে দেয়, ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজির মধ্যে নতুন রূপ ও ছোঁয়া তৈরি করে। এটি আমাদের অনুবাদের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় ও বিস্তৃত করে।'

'রক্তকরবী' প্রদীপের শিখা ও ছাই-এর গল্প

মলয় রক্ষিত

আশ্বিন ১৩৩১ (সেপ্টেম্বর ১৯২৪)-এর 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে 'রক্তকরবী'। নাটকটি প্রকাশের আগেই একাধিকবার তিনি আত্মীয়সভায় পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এরকমই কোনো সভায় পাঠ করে শোনানোর আগে তিনি নাটকটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন;যে বক্তব্যটি লেখা হয়েছিল ১৩৩১ (১৯২৪)-এর কোনো এক সময়, কিন্তু সেটি ছাপা হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩২ (এপ্রিল ১৯২৫) সংখ্যায় 'কবির অভিভাষণ' নামে। এই লেখাটিকেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রস্তাবনা' নামে 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণের (ডিসেম্বর ১৯২৬) নাট্যসূচনায় রেখেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী মুদ্রণে প্রস্তাবনা-স্বরূপ এই লেখাটিই 'অভিভাষণ' শিরোনামে গ্রন্থের শেষে 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশে চলে আসে। যাই হোক, কবির এই 'অভিভাষণ' আদতে ছিল পাঠক বা শ্রোতার উদ্দেশে 'রক্তকরবী'-র বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের পাঠ-নির্দেশ। নাটকটিকে কীভাবে দেখা যায়, কীভাবে পড়া যায়;তার কিছু চিন্তাসূত্র যেন তিনি পাঠক-শ্রোতাদের দিয়ে রেখেছেন।

'অভিভাষণ'-লেখাটির বড়ো অংশ জুড়েই আছে যক্ষপুরী এবং সেই যক্ষপুরীর রাজার কথা। যক্ষপুরী ও সেখানকার রাজার পরিচয়ের সত্যমূলকতা বোঝাতে গিয়ে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে তাঁর নাট্যকাহিনিকে মিলিয়ে বেশ কিছু কথা বললেন। রামায়ণের যেমন লঙ্কাপুরী, তেমনি তাঁর যক্ষপুরী;দুটোই সোনার ভাণ্ডার, দুটোই ঐশ্বর্যে আকর্ষণীয়। রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কাকে যেমন সুপরিনির্দিষ্ট একটি মাত্র ভৌগোলিক স্থান বলে চিহ্নিত করা যায় না, তেমনি যক্ষপুরীরও প্রকৃত ঘটনাস্থান কোথায় তা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আদিকবির রামায়ণের লঙ্কাপুরী আর 'রক্তকরবী'-র যক্ষপুরীকে মিলিয়ে দিচ্ছেন কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বান্দ্বিক সূত্রকে ধরে। আর এখানেই নাটকটি হয়ে উঠছে সভ্যতার এক চিরন্তন দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের ধারক। সেই ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ ধরেছেন দুটি মাত্র বাক্যে; 'কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসের মতোই।'

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যামতে তাহলে বোঝা গেল, আদিকবির লঙ্কাপুরীর মতোই এ-কালের যক্ষপুরী হল আদতে আকর্ষণজীবী অর্থাৎ শোষণজীবী সভ্যতা;যা সোনার ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে কৃষিপল্লি থেকে কৃষকদের কেবলই হরণ করে নিচ্ছে। ঠিক যেভাবে মায়ামৃগ;সোনার হরিণের লোভে সীতা ধরা পড়েছিলেন রাবণের হাতে, তেমনই;দানবীয় লোভের বশীভূত হয়েই চাষীরা গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসে। যক্ষপুরী তাহলে সেই শোষণজীবী কোনো সভ্যতা যা প্রকৃতির বুক থেকে সম্পদ ছিনিয়ে বা হরণ করে নিয়ে এসে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। আর সেই ঐশ্বর্যের লোভেই কৃষিক্ষেত্র উজাড় করে মানুষ চলে আসে সেই যক্ষপুরীতে। এভাবেই আশেপাশের গ্রাম থেকে উঠে এসেছে যক্ষপুরীর শ্রমিকের দল;নাটকে যাদেরকে 'দশ পঁচিশের ছক' বলেছে বিশু পাগল।

বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যার মধ্যে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে একরকম রূপকের আভাস রয়েছে। যক্ষপুরী যেন আধুনিক কোনো শোষণজীবী সভ্যতার রূপক, যে সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যই হল প্রকৃতির বুক থেকে ধনসম্পদ হরণ করে এনে ধনভাণ্ডারে জমা করা। এই যক্ষপুরীকে অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানিক ভূগোল দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। পৃথিবীর যে-কোনো স্থানেই গড়ে উঠতে পারে এক-একটি যক্ষপুরী। যক্ষপুরীর যিনি মালিক অর্থাৎ রাজা;তাকে রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে দিয়েছেন লঙ্কারাজ রাবণের সঙ্গে। লঙ্কারাজ রাবণের মতো দশ মুণ্ড বিশ হাত তিনি দিতে পারেননি বটে, কিন্তু রাবণের মতোই যক্ষপুরীর রাজার আছে অপরিমিত শক্তিবাহুল্য। লঙ্কারাজ রাবণের পতনের কারণ যেমন তারই সহোদর ভাই বিভীষণের কারণে ঘটেছিল, তেমনি যক্ষপুরীর রাজার ভিতরেই আছে একই দেহে রাবণ ও বিভীষণের উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;তআমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।দ লঙ্কায় সীতার আগমন যেমন লঙ্কারাজের পতনের কারণ হয়ে উঠেছিল, তেমনি যক্ষপুরীতে নন্দিনী নামক একটি মানবকন্যার অযাচিত আবির্ভাব সেখানকার রাজার মনোজগৎকে টলোমলো করে দিয়েছিল।

সবমিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অভিভাষণ'-এ 'রক্তকরবী'র যে ব্যাখ্যা তাঁর পাঠক-শ্রোতাদের উদ্দেশে রেখেছেন, তাতে যক্ষপুরীকে ঘিরে যেমন আধুনিক শোষণজীবী সভ্যতার স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা রয়েছে, তেমনি এই নাট্যকাহিনির ভিতরকার দ্বান্দ্বিকসূত্রটিকেও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে কখনও কর্ষণজীবী-আকর্ষণজীবী সভ্যতার চিরন্তন দ্বন্দ্বের কথায়, কখনও 'ব্যক্তিগত মানুষ' আর 'মানুষগত শ্রেণী'র আভাস দিয়ে। আর এই সমস্ত ব্যাখ্যায় পাঠক-শ্রোতা যদি রূপক ও তত্ত্বকথার জটিল জালে খেই হারিয়ে ফেলেন, তাই শেষে তাঁদের উদ্দেশে চেতাবনি দিয়ে রাখলেন;ত্রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়দ।

'রক্তকরবী'-র সঙ্গে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের কাহিনির সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেন। সেটি হল;'রক্তকরবী'র মতোই রামায়ণও একালেরই কথা, এমন নয় যে রামায়ণ থেকে তিনি তাঁর গল্পটি আহরণ করেছেন। বরং আদিকবিই ধ্যানযোগে তাঁর গল্পটিকে হরণ করেছেন। কেন না, 'রক্তকরবী'র মতোই রামায়ণ আসলে একালেরই গল্প। ঠিক যেমন 'রক্তকরবী' প্রকাশের এই একশো বছর পরে;২০২৫-এ দাঁড়িয়ে;আজকের দিনেরই গল্প। আর তাই 'অভিভাষণ'-এ রবীন্দ্রনাথ আদিকবির রামায়ণের সঙ্গে 'রক্তকরবী'-র এত সাদৃশ্যের কথা বললেও একাধিকবার এই কথা জানাতে ভোলেননি যে এর বিষয় কিন্তু পৌরাণিক কালের নয়;একেবারে সাম্প্রতিক কালের। এবং সেই হিসেবে রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কার যে ঐশ্বর্যের দর্প;তার প্রকাশও অতীতের চেয়ে বেশি বর্তমান কালেই দেখা যায়। প্রশ্ন তুলেছেন তিনি;তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল? রামায়ণের কালে এই ঘটনা ঘটুক আর নাই ঘটুক, বিংশ শতাধীর ইতিহাসে এই ঘটনা যে অহরহ ঘটছে, রবীন্দ্রনাথ তা জানেন। তাই এ কথা বলছেন; 'আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?'

বস্তুত, তিনি একালের গল্প শুনিয়েছেন, একেবারে সাম্প্রতিককালের সমস্যার কথা। তবু যে তাঁকে যক্ষপুরীর বাস্তবতার প্রমাণ দিতে গিয়ে বাল্মীকির রামায়ণের দোহাই পাড়তে হল;এইটেই আশ্চর্যের। 'রক্তকরবী'র বিষয় পাঠক ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারবেন কি না, এ নিয়ে বাঙালি পাঠকের বিদ্যেবুদ্ধির উপর তাহলে কি তিনি ভরসা করতে পারছিলেন না? এই অনুমানের কতকটা বাস্তব ভিত্তি আছেই। কেন না, 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে-মাসে 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হচ্ছে;আশ্বিন ১৩৩১ (সেপ্টেম্বর ১৯২৪), ঠিক সেই মাসেই

'Visva-Bharati Quarterly' পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যায় (Vol-II–No-II—সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রকাশিত হচ্ছে নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ 'Red Oleanders'। একই মাসে প্রকাশিত হল 'রক্তকরবী' এবং তার ইংরেজি অনুবাদটিও। অথচ গ্রন্থাকারে 'রক্তকরবী'-র প্রকাশের (ডিসেম্বর ১৯২৬) অনেক আগেই ১৯২৫-এ লন্ডনের ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে 'Red Oleanders'। খুব স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নিয়ে অনেক বেশি কৌতূহলী ছিলেন তাঁর ইউরোপীয় পাঠকদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'রক্তকরবী' একান্তভাবেই ইউরোপীয় পাঠকদের পক্ষে উপযুক্ত। এর নাট্যবিষয় এবং নাট্যসমস্যা আসলে পশ্চিমী সভ্যতারই সমস্যা। কাজেই এদেশীয় বাঙালি পাঠক নয়, পশ্চিমী পাঠকই হতে পারেন তাঁর 'রক্তকরবী'-র প্রকৃত সমঝদার। সুতরাং 'রক্তকরবী'র বছর দেড়েক আগে 'Red Oleanders' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে তিনি আসলে বুঝে নিতে চাইলেন, পশ্চিমী পাঠক কীভাবে গ্রহণ করেন এই নাটকটিকে।

'Red Oleanders' গ্রন্থ হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় পাঠকদের মধ্যে খানিক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল। অনেকেই বললেন, নাটকটি বোঝা যাচ্ছে না, টেগোর কী বলতে চাইছেন তা ধরা যাচ্ছে না। নাটকটির বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ এল। বিচলিত রবীন্দ্রনাথ তড়িঘড়ি 'Red Oleanders Author's Interpretation' শীর্ষক একটি দীর্ঘ ব্যাখ্যা লিখে লন্ডনের 'The Manchester Guardian' পত্রিকায় পাঠালেন। পরে এই লেখাটিই 'Visva-Bharati Quarterly' পত্রিকার অক্টোবর ১৯২৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হল। খুব নিবিড় মনোযোগ নিয়ে পড়লে বোঝা যায়, 'রক্তকরবী'র বাংলা ব্যাখ্যানের থেকে কবির ইংরেজি ব্যাখ্যান অনেকটাই স্বতন্ত্র। 'রক্তকরবী'-র মূল বক্তব্য যে কী, রবীন্দ্রনাথ আসলে নাটকটির মধ্যে দিয়ে বর্তমানের কোন সমস্যাকে ধরতে চেয়েছিলেন, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ওই ইংরেজি ব্যাখ্যায় পাওয়া সম্ভব।

Authorós Interpretation-এ রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে রামায়ণ অথবা পুরাণের প্রসঙ্গ লেশমাত্র নেই। এই আলোচনায় এমনকী যক্ষপুরী;'Red Oleanders'-এ যাকে 'Yaksha Town' বলা হয়েছে;সেই স্থানটির প্রসঙ্গও রবীন্দ্রনাথ তোলেননি। বরং সমগ্র আলোচনাটিই তিনি করেছেন শুধু পশ্চিমী সভ্যতাকে নিয়ে। সেই পশ্চিমীবিশ্বের সমস্যা দিয়েই 'Red Oleanders'-কে বোঝাতে চেয়েছেন। আর সেই আলোচনার ভিতর থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমরা বুঝে নিতে পারি, 'রক্তকরবী'-তে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বিশ্বের কোন সমস্যাকে ধরতে চেয়েছিলেন।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, Authorós Interpretationé-এ রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যক্ষপুরীর রাজা এবং তার গড়ে তোলা সিস্টেমটির উপর। এই রাজা তাঁর কাছে কোনো ব্যক্তি মানুষ নন;এক দানবীয় শক্তিমাত্র, আর তার সিস্টেমটি হল আধুনিক কালের 'অর্গানাইজেশন';অর্থাৎ দানবীয় যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;"Today another factor has made itself immensely evident in shaping and guiding human destiny. It is the spirit of organization– which is not social in character– but utilitarian." তাহলে বর্তমান বিশ্বের মানবভাগ্যের নিয়ন্ত্রক আর মানুষ নয়, আকবর বা ঔরঙ্গজেব-রা নন, সেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আছে এক পাওয়ার;যূথবদ্ধ সংঘশক্তি। এর চারিত্র্য কোনো সমাজকেন্দ্রিক নয়, বরং উপযোগিতাকেন্দ্রিক। সেই অর্গানাইজেশনই এখন বর্তমান বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা রূপে আবির্ভূত। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ এখন শান্তির জন্য চার্চে যায় না, যিশুর কাছে যায় না;যায় লিগ অব নেশনস্-এর কাছে। আধুনিক ইউরোপে ব্যক্তিমানুষ মাত্রেই কোনো না কোনোভাবে ওই পাওয়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি লিখছেন;"The world has become the world of Jack and Giant—the Giant who is not a gigantic man– but a multitude of men turned into a gigantic system."। উপযোগবাদকেন্দ্রিক (utilitarian) শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ইভিল পাওয়ার হিসেবেই দেখছেন। আর সেই ইভিল পাওয়ার তৈরি করছে সাধারণ মানুষ, যূথবদ্ধ মানুষের সম্মিলিত আনুগত্যই তো আসলে প্রতিষ্ঠা দেয় সেই পাওয়ার-স্ট্রাকচারকে।

লিগ অব নেশনস্; রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই উদাহরণই রেখেছেন সেই অরগানাইজড্ পাওয়ার-এর উদাহরণ রাখতে গিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতেশান্তি আনার জন্য জানুয়ারি ১৯২০-তেগঠিতহয়েছিল লিগ অব নেশনস্। বিশ্বরাজনীতিতে ব্যক্তি ক্ষমতার অবসান অনেক আগেই ঘটেছিল, লিগ অবনেশনস গঠিত হবার পর'নেশন'বা 'রাষ্ট্র'ক্ষমতার চেয়েও ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠলসংস্থা;অরগানাইজেশন। পশ্চিমী বিশ্বের এই অরগানাইজড্ পাওয়ার-এর কথাসূত্র ধরেই আমরা 'রক্তকরবী'র রাজাকে, তার সাধের যক্ষপুরীকে আর একরকমভাবে চিনে নিতে পারি বই-কি।

যক্ষপুরীর রাজাকে দেখা যায় না কেন? কেন সে নিজেকে জটিল জালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছে? রাজা কি মানুষ? আর পাঁচজন মানুষের মতোই সে কি কথা বলে? ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটায়? নন্দিনীর সংলাপে রাজার চেহারার একরকম বর্ণনা আছে;তদেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাত-মহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহু দুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল।মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।দ তযেন যুগযুগান্তরের মানুষ, যেন ভীষ্মপিতামহদ (প্রথম খসড়ার পাঠে)। কিন্তু এই চেহারার কল্পনাও ঘুলিয়ে যেতে পারে যখন রাজা নিজের সম্পর্কে বলে;আমি পর্বতের চূড়ার মতো, আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, আমি রিক্ত আমি ক্লান্ত। অথবা বলে তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে। 'কবির অভিভাষণ'-এ রাবণের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন;রাজার একাধিক মুন্ডু আর হাত পা তিনি দিতেই পারতেন, কিন্তু আদিকবির মতো ভরসা পাননি। তবে এ

কথাও জানাতে ভোলেননি;'বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা-যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে।' রাজা যে আসলে কোনো ব্যক্তিমানুষ মাত্র নয়, সে যে আসলে একটি অরগানাইজড্ পাওয়ার--যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিই যে রাজারসেই দানবীয়শক্তির উৎসতার ইঙ্গিত যেমন Authorós Interpretation-এ আছে, তেমনি অভিভাষণেও আছে। যক্ষপুরীর রাজা স্বয়ং কি বিজ্ঞানী নয়? নাটকে তেমন আভাস কি নেই? আছে বই কি, রাজা যখন নন্দিনীকে বলে;'আমি তোমাকে উল্টিয়ে. পাল্টিয়ে দেখতেচাই,না পারিতো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই';এই দেখাও তো বিজ্ঞানের দেখা;ভেঙে চুরে বিশ্লেষণ করে দেখা। সৃষ্টিকর্তার চাতুরি ভেঙে বিশ্বের মর্মস্থানে পৌঁছানো, তাকে আয়ত্তের মধ্যে ধরবার ইচ্ছে, সমস্ত কিছুকে জানবার দ্বারা আত্মসাৎ করা;এসব তো বিজ্ঞানীরই লক্ষণ। এমনকী 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়ায় খুব প্রত্যক্ষভাবে রাজার নিজস্ব ল্যাবরেটরির কথাও ছিল। অধ্যাপকের সংলাপে আছে;'এখন থেকে সমস্ত দিন ও থাক্‌বে ওর গোপন পরীক্ষাশালায়।সেখানকার খবরও কাউকে জানতে দেয়না।' এই গোপন পরীক্ষাশালাতেই কি রাজা তার জানতে চাওয়া মন নিয়ে বস্তুবিশ্বকে বিশ্লেষণ করে। এখানেই কি গোপনে প্রস্তুত হয় না ভয়ানক সব মারণাস্ত্র? যে-সব মারণাস্ত্র দিয়েই তো রাজা যক্ষপুরীর বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়। সেই মারণাস্ত্রের আঘাতেই গজ্জু পালোয়ানের ভিতরটা ফাঁপা হয়ে যায়। বাইরে থেকে চোট দেখা যায় না অথচ গজ্জুর গায়ের জোর শুধু নয়, ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয় রাজা। গজ্জুর ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি লড়তে গেলে তাকে রাজা এমন শাস্তি দেয়, যাতে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতোও কোথাও দেখা যায়নি। রাজাকে স্পর্ধা করে আক্রমণ করে কিশোর, সে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। এমন সব অস্ত্র তো বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতেই সম্ভব।

রাজার এমন অবিশ্বাস্য শক্তির পিছনে আছে তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তি। যে জটিল জালের পিছনে রাজা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে, সেই জালও কি আধুনিক বিজ্ঞানের দান নয়? অধ্যাপকের ভাষায় সে হল 'মানুষ ছাঁকা জাল';মানুষের থেকে প্রয়োজনীয় সারবস্তুটুকু নিয়ে বাকিটাকে ছুঁড়ে ফেলা। আবার এই জাল শুধু যে রাজার ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা তো নয়, সমগ্র যক্ষপুরীই যেন সেই জালের বাইরে নয়। আজকের ভাষায় আমরা তাকেই তো বলি নেটওয়ার্ক; মুঠ্ঠি মে ভরলো দুনিয়া। রাজারজালও কি আধুনিক কোনো নেটওয়ার্ক? না হলে কেনই বা রবীন্দ্রনাথ 'Red Oleanders'-এ রাজার জালকে ইংরেজিতে 'network' করবেন? নাটকটির শুরুতে রাজার প্রাসাদের জালের আবরণের কথাতেই শুধু নয়, নন্দিনী ও অধ্যাপকের প্রথম কথোপকথনেও এসেছে নেটওয়ার্কের প্রসঙ্গ; নন্দিনী আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে। অধ্যাপক জান নন্দিনী? ,আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখনি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত। এই অংশটির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছেন;

Nandini I shall find my way through the net-work. Professor Do you know– Nandini– I too live behind a net-work of scholarship. I am an unmitigated scholar– just as our king is an unmitigated King.

রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে রাজা এবং তার বিধি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক অনাগত আধুনিক বিশ্বের সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে পারে, এমন এক ক্ষমতা-কাঠামোকেই ধরতে চেয়েছিলেন?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিমীবিশ্ব যে ক্রমশ শক্তির পূজারি হয়ে উঠছিল, 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তুর্কি আক্রমণোত্তর যুগের বাংলায় চণ্ডী মনসা প্রভৃতি অনার্য শক্তিদেবতার উত্থান ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আধুনিক পশ্চিমীবিশ্বের এই শক্তিসাধনার তিনি সাদৃশ্য দেখেছিলেন। সেই সাদৃশ্য নিঃসন্দেহে দুটি দিক থেকে;এক, ক্ষমতার মানবিকতার লেশশূন্য হিংস্রতায়, নীতিহীন অনায্য-অন্যায়ের বলদর্পিতায়, এবং দুই;ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় মানুষের প্রশ্নহীন আনুগত্যে। তবে পশ্চিমীবিশ্বের এই আধুনিক শক্তিমত্তার প্রধান লক্ষণ তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতায়;যার পিছনে ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। Authorós Interpretationé-এ রবীন্দ্রনাথ সেই মানবিক অনুভূতুশূন্য, সহমর্মিতাহীন এই শক্তিমত্তার ছবিটি এঁকেছেন এই ভাষায়

...I can say– on behalf of inarticulate Asia– what a terrible reality for us is the West– whose relation to ourselves is to little human. The view that we can get of her– in our mutual dealings– is that of a titanic power with an endless curiosity to analyse and know– but without sympathy to understand— with numberless arms to coerce and acquire of soul to realise and enjoy.

...Such an objectified passion lacks the true majesty of human nature— it only assumes a terrifying bigness– its physiognomy blurred through its cover of an intricate network—the scientific system. It barricades itself against all direct human touch with barriers of race pride and prestige of power.

পশ্চিমীবিশ্বের সেই শক্তিমত্তার চেহারাটি তাহলে রবীন্দ্রনাথের চোখে 'terrifying bigness';বিরাটত্বের ভয়াল-ভয়ংকর চেহারা। তাঁর ব্যাখ্যায় রাজার জালটিও এখানে খুব স্পষ্টত;'বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্র' নামক একটি 'জটিল নেটওয়ার্ক'।

সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসক্ষমতার চূড়ান্ত নিদর্শন মানুষ দেখেছিল হিরোশিমা ও নাগাসাকির আনবিক বোমার বিস্ফোরণে। 'রক্তকরবী'র রাজা সেই বিজ্ঞান ও যন্ত্রের বলেই বলীয়ান এক যূথবদ্ধ ক্ষমতার দানবীয় মুখ;দ্য বিগ ব্রাদার, আর তার যক্ষপুরী হল একটি সুসংবদ্ধ যান্ত্রিক

বিধিব্যবস্থা;রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অরগানাইজেশন। সুতরাং মানুষের চেহারায় সেই রাজাকে ধরা সম্ভব নয়, যেমন কারও পক্ষেই সম্ভব নয় যক্ষপুরীর অদৃশ্য প্রাচীর পেরিয়ে সিস্টেমের নজরের বাইরে যাওয়া। সর্দারের প্রহরীরা অথবা সরকারি খরচে চৌকিদারেরা চারদিকে নজর রাখছে বলেই নয়;গোটা যক্ষপুরীই যেন সি সি টিভি দিয়ে ঘেরা। সি সি টিভি? একশো বছর আগে? 'রক্তকরবী'র প্রথম সাতটি খসড়ায় তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে রাজার চোখে চশমার প্রসঙ্গ ছিল;রাজার চোখে সর্বদাই থাকে সেই চশমা, এমনকী রাজা রাতেও না কি চশমা পরে ঘুমোয়। প্রথম খসড়া থেকে অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের সেই প্রাসঙ্গিক সংলাপ ছিল এরকম;

—ওকে আমরা বলি মকর।

— কেন বল তো?

— মকরের মত ওর চোখের উপর পর্দ্দা নেই, একটা চষমা আছে। শুনেচি, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনো খোলে না।

—তার কারণ?

— ওর চশমায় যে ছায়া পড়ে তার দাগ থাকে। ঘুমের সময় কি দেখা দিয়েছিল জেগে উঠে তা জানতে পায়। চোখ ভুল দেখ্‌তেপারেবলে' শুনেচি নিজের চোখ প্রায় বুজেই রাখে, চষমার উপরেই দেখবার ভার।

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে এ তো সি সি টিভিই। সুতরাং জর্জ অরওয়েলের 'নাইনটিন এইট্টি ফোর'-এর সর্বেসর্বা নেতার নেটওয়ার্কের মতোই; রাজার নজরের বাইরে আমরা কেউ নই। বিশ্বের যে-প্রান্তেই আপনি লুকোন না কেন;বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ।

যক্ষপুরীর রাজার এই শক্তিমত্তার যে গঠনকাঠামো;তার কেন্দ্রীয় উৎসে আছে লোভ ও লালসা;পুঁজির লালসা। বিশ্বের মর্মস্থানে লুকোনো সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে কুক্ষিগত করবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। বিশ শতকের প্রথম দুটি দশকে উন্নতবিশ্বের দেশগুলিতে বিগ ইন্ডাস্ট্রির রূপ ধরে মুনাফালোভীদের পুঁজির দাপট যে-ভাবে বাড়ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে প্রমাদ গুণেছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠতরাজই নয়, বিগ ইন্ডাস্ট্রির আরও বড়ো বিপদ রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছিল দুইভাবে;প্রথমত, সহজ সুন্দর প্রকৃতির সবুজ ধ্বংস, প্রযুক্তিনির্ভর নদীবাঁধের ফলে নষ্ট হওয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং তারই অনিবার্য ফল স্বরূপ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ। দ্বিতীয়ত,;গ্রাম ধ্বংস হচ্ছে, কৃষিক্ষেত্র উজাড় হয়ে রাতারাতি শিল্পক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে, আর কর্ষণজীবী জমিসংলগ্ন অভাবী কৃষকরা পরিণত হচ্ছেন শ্রমিকে। অন্যদিকে মুনাফালোভী মালিকদের অন্তহীন শোষণের ফলে আলোহীন আশাহীন অন্ধকার জঠরে তলিয়ে যাওয়া সেই শ্রমিকরা তাদের ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে অনিবার্যভাবে রাজার এঁটোতে পরিণত হচ্ছে। কলিযুগে কৃষিকাজ থেকে হরণ করে কৃষকদের শ্রমিক বানিয়ে কৃষিপল্লিকে কীভাবে উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে;কর্ষণজীবীদের সেই কথাগুলিই তিনি 'কবির অভিভাষণ'-এ শুনিয়েছেন। যক্ষপুরীর খোদাইকরেরাও ঠিক সেভাবেই সোনার ঐশ্বর্যের লোভে পড়ে গ্রাম ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল যক্ষপুরীতে। বিশুর ভাষায়;'বারো ঘণ্টার পরে আরও চার ঘণ্টা' পরিশ্রম করে, সুস্থসুন্দর জীবন ও সংস্কৃতির মূল স্রোত থেকে বিযুক্ত হতে হতে ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে এক সময় তাদের পরিণত হতে হয় মালিকের দশ পঁচিশের ছকে। যক্ষপুরীর সুসংবদ্ধ যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় অন্যথা হওয়ার যো-টি নেই। একবার যক্ষপুরীতে ঢুকলে সমস্ত হাঁ বন্ধ হয়ে গিয়ে কেবল একটি মাত্র পথ খোলা থাকে;সেটি খনিমুখের জঠরে যাওয়ার রাস্তা। কিশোর কাজে ফাঁকি দেয়;তার পিছনে লাগানো হয় ডালকুত্তা। বিশু কোথায় যাচ্ছে, কার কার সঙ্গে মিশছে;তার প্রতিটি গতিবিধি আতসকাচের নিচে ফেলে বিচার করা হয়। মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারিতে একটুকুও ফাঁক নেই। ফাগুলালদের মতো অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য খুলে রাখা আছে মদের ভাটিখানা। আর মদে যারা না-ভুলবে তাদের জন্য আছে ভিন্নতর মদ;হরিনামের মদ্য। গোসাঁইজিকে আনিয়ে রাখা হয় কারিগরদের কানে শান্তিমন্ত্র দিয়ে, অশান্ত মনকে ঠাণ্ডা করে নামগান শুনিয়ে শান্ত করবার জন্য। বিদ্রোহী হয়ে ওঠা ট-ঠ পাড়া, মুর্ধণ্য পাড়ার জন্য জারি করা হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা, ফৌজ মোতায়েন করে ডান্ডা মেরে তাদের ঠাণ্ডা করা হয়, তারপর চলে গোসাঁইয়ের নাম গানের পালা। আর গজ্জু পালোয়ানদের মতো বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আছে রাজার নতুন নতুন মারণাস্ত্র।

মুনাফালোভী এই ক্ষমতা-কাঠামোর সুসংবদ্ধ শাসন ও শোষণের ফলে অচিরেই শ্রমিকরা পরিণত হয় রাজার এঁটোতে। রাজার প্রাসাদের খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত-মাংস-মজ্জাহীন সেই সমস্ত 'রাজার এঁটো'দের মধ্যেই নন্দিনী দেখতে পায় তারই গ্রামের ছেলে, নিকট-পরিচিত কিছু মানুষদের মুখ;অনুপ, উপমন্যু, কঙ্কু বা শক্‌লুকে। নন্দিনীরমনেহয়যেনপ্রেতপুরীরদরজা খুলেগেছে। তারা সবাই নন্দিনীরই সমবয়সী।বয়সকত আরহবে;মধ্যকুড়ির আশেপাশেই। যক্ষপুরীরশোষণে এরই মধ্যে ছিবড়ে আখের মতো, মরচে পড়ে খয়ে যাওয়া লোহার মতো হয়ে গিয়ে এখন মালিকের কাছে তারা নিছক পরিত্যক্ত বোঝা মাত্র। তাই তাদের যক্ষপুরীর বাইরে বের করে দিয়ে আসা হচ্ছে, পরিবর্তে নিয়ে আসা হবে নতুন শ্রমিক। শোষণের এই সুসংবদ্ধ বিধিব্যবস্থাকে অধ্যাপক ব্যাখ্যা করে 'বড়ো হবার তত্ত্ব' বলে। 'ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখাদ;এই হল বড়ো হবার তত্ত্ব। দুনিয়াজুড়ে 'মানুষ চালানো' এই ব্যবসায়ীদের স্বরূপ, তার শক্তিমত্তার চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য, সেই ক্ষমতার গঠন-কাঠামোর প্রতিটি কলকব্জা;এ-সবই তো রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর Authors Interpretation-এ।

'রক্তকরবী'-তে ক্ষমতা-কাঠামোর যে পরিচয় আমরা পাই, বিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রেক্ষিত থেকে দেখলে তাকে কোনো একক রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিরূপ কি বলা যাবে? দুই ও তিনের দশকে উদ্ভূত নব্য

ফ্যাসিবাদ বলা যাবে কি? মনে রাখতে হবে, ১৯২৬-এ যখন 'রক্তকরবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই বছরেই তিনি নব্যফ্যাসিস্ট মুসোলিনি সরকারের আমন্ত্রণে ইতালি সফরে যাচ্ছেন। মুসোলিনির স্তাবকবৃন্দ পরিবৃত হয়ে ইতালি গঠনে মুসোলিনির প্রশংসাও করছেন। আবার তাঁর পশ্চিমী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারছেন, মুসোলিনি সম্পর্কে তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। ফ্যাসিবাদকে তিনি কানাকড়িও সমর্থন করেন না, আগে জানলে ইতালি সফর তিনি বাতিল করতেন।

১৯২৭-এ আইনস্টাইন, আঁরি বারবুস, রোমা রোলাঁ প্রমুখের চেষ্টায় প্যারিসে ফ্যাসিস্ট বিরোধী বুদ্ধিজীবী সম্মেলনের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ সহমর্মিতা জানিয়ে স্বাক্ষর করেন। ফ্যাসিবাদের বিপদ তিনি বুঝতেন;জারতন্ত্রই হোক বা বলশেভিকতন্ত্র,সাধারণ জনগণের ব্যক্তিসত্তাকে মেরে ফেলে দাবার ঘুঁটি বানিয়ে তোলা শাসক মাত্রই যে আসলে মানুষ চালানো ব্যবসায়ী, সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু চরমতম ফ্যাসিবাদী শাসকেরও পতন ঘটে। শাসকের মারের মুখের উপর দাঁড়িয়েও শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রে গণঅভ্যুত্থান হয়। মুসোলিনিকে একদিন প্রকাশ্য রাস্তায় খুন হতে হয় তারই দেশের জনগণের হাতে। হিটলার থেকে ফ্র্যাঙ্কো;প্রতিটি ফ্যাসিস্ট শাসকেরই ভয়াবহ পরিণতি দেখেছে ইতিহাস।

যক্ষপুরী কি নিছক একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা? রাজা বা তার গড়ে তোলা সর্দারতন্ত্র কি ফ্যাসিবাদের নামান্তর? 'রক্তকরবী' নাটকে তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই, তেমন কোনো লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল বলেও মনে হয় না। ইতিহাসের নিয়মেই ফ্যাসিবাদের একদিন অনিবার্য পতন ঘটেই। সদ্য ঘটে যাওয়া নভেম্বর বিপ্লব ও জারতন্ত্রের পতন রবীন্দ্রনাথের কাছে জলজ্যান্ত উদাহরণ ছিল। 'রক্তকরবী'তে তিনি ফ্যাসিবাদের সমস্যার কথা বলেননি, বরং সমকালীন ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আরও বড়ো, আরও ভয়াবহ এক সমস্যার কথা তাঁকে ভাবিয়েছিল;সেই সমস্যা নব্যউদ্ভূত অরগানাইজেশনের, সুসংবদ্ধ এক ক্ষমতা কাঠামোর। এমন এক ক্ষমতাকাঠামো যার গঠনতন্ত্রের খুঁটি হিসেবে আছে রাষ্ট্র, আছে বৃহৎ পুঁজি, আছে সুসংবদ্ধ ক্ষমতার প্রতি জনগণের নীরবসম্মতি ও স্তুতি, আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আস্ত্রবল ও বাহুবল। বিশ্বব্যবস্থার অনাগত দিনগুলিতে মানবসভ্যতার কাছে এই ক্ষমতাকাঠামো বা অরগানাইজেশন-ই হয়ে উঠবে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ক্ষমতার নিষ্পেষণ থেকে আত্মসত্তা বা ব্যক্তিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ, প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ। সেই ক্ষমতাকাঠামোকে ভেঙে না ফেলতে পারলে, ধ্বংস না করতে পারলে আমাদের নিস্তার নেই।

কীভাবে ভাঙা সম্ভব সেই সুসংবদ্ধ ক্ষমতাকাঠামোকে? রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়ে? না, রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। রাষ্ট্রবিপ্লবে শাসকের পতন ঘটে ঠিকই, কিন্তু সিংহাসন কি সত্যিই ক্ষমতারাজ থেকে মুক্ত হয়? ইতিহাস বলে, রাষ্ট্রবিপ্লবে ক্ষমতার হাতবদল ঘটে মাত্র, এক ক্ষমতার পতনে আর-এক ক্ষমতার জন্ম হয়। ক্রমে সেই ক্ষমতাও প্রভুত্বের আঁটঘাট বেঁধে গুছিয়ে বসে, জনগণের থেকে একইরকম আনুগত্য দাবি করে। ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করলে বোঝা যায়, আজ থেকে একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ কথিত ওই অরগানাইজ্‌ড্‌ পাওয়ার-স্ট্রাকচারবা বিধিবদ্ধ যান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোটি ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়েছে শুধু নয়,তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েপড়েছে তৃতীয় বিশ্বজুড়ে। রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে যুদ্ধবিগ্রহ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষেত্র থেকে ব্যবসাবাণিজ্য, খুচরো মার্কেট থেকে শেয়ারবাজার, মেধাসম্পদ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ, খেলাধূলা থেকে বিনোদন;প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ বৃহৎ কোনো না কোনো অরগানাইজেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই সব বিগ ব্রাদারদের অস্বীকার করে ব্যক্তিমানুষ তো দূরের কথা;কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেও বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। আমরা সত্যিই জানি না, ওই ক্ষমতাকাঠামোকে কীভাবে ধ্বংস করা সম্ভব, বা আদৌ সম্ভব কি না! আমাদের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছেও কি কোনো উত্তর ছিল?

সম্ভবত ছিল না। তাই নিছক রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয়েছিল অন্যকিছু। 'রক্তকরবী'-তে সমস্যার সমাধান খুঁজতে তিনি তাত্ত্বিকতার আশ্রয় নিলেন। নিয়ে এলেন নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনার তত্ত্ব। নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনার ফলেই পুরুষ তার স্বরচিত কারাগার ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করতে চাইল। এই তত্ত্বের আধারেই শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের হাতে নন্দিনী হয়ে ওঠে প্রেম ও মুক্ত-সৌন্দর্যের প্রতীকায়িত রূপ। আবার নন্দিনীর পাশাপাশি রাজা-কে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ আর-এক তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। ঠিক যেভাবে 'মুক্তধারা' নাটকে নদীবাঁধের যন্ত্রকাঠামোকে ভাঙতে তাঁকে অভিজিৎ-এর মাতৃঋণ পরিশোধের তত্ত্ব এনে বাঁধের ত্রুটির জায়গায় আঘাত করে যন্ত্রাসুরকে ভাঙার আয়োজন করতে হয়েছিল, 'রক্তকরবী'তেও সেইভাবে বাল্মীকির দোহাই দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়ে এলেন;'একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ'-এর তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;'সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে'।

সুতরাং ফাগুলালের দলবল বন্দিশালা ভেঙে ফেলে বিশুকে ছিনিয়ে নেওয়ার আগেই স্বয়ং রাজা ভেঙে ফেলেছে তার জালের দরজা, ভেঙেছে যক্ষপুরীর মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড। নন্দিনীর হাতে হাত রেখে, ফাগুলালদের সঙ্গে মিশে, তারই হাতে গড়া এতকালের সিস্টেমকে;পাওয়ার স্ট্রাকচারকে;ভাঙতে এগিয়ে গেছে। সুতরাং ব্যক্তি নয়, নিছক সংঘবদ্ধ মানুষের গণ-আন্দোলন নয়, একমাত্র সিস্টেমই পারে সিস্টেমকে ভাঙতে;এই তাত্ত্বিক অবস্থানেই রবীন্দ্রনাথ স্থিত হয়েছেন। রবীন্দ্রকথিত এরকম কোনো তত্ত্বকাঠামোর বাস্তবায়ন আগামী পৃথিবীতে কি আদৌ সম্ভব যা ভুবনজোড়া নেট-ওয়ার্কবিস্তারী বিগ ব্রাদারদের ধ্বংস করতে পারে?

(লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক)

নাগরিক স্মৃতিচারণা

লায়লা কবির : এক সাহসিনী বাঙালি নারী

প্রত্যয় সরকার

বাংলা সংবাদ-মাধ্যম যখন রাজনীতির পঙ্কিল স্রোতে মিথ্যা ঢক্কা নিনাদ ছড়িয়ে টি-আর-পি তুলতে ব্যস্ত, তখন কোথাও দুটো বাক্য ব্যয় করে লেখা হলো না বাঙালি সাহসিনী নারী লায়লা কবিরের মৃত্যু সংবাদ। দিল্লির বাড়ি থেকে ১৫ মে ২০২৫ সন্ধেবেলায় নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন লায়লা কবির। শেষ দুটি বছর ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তাঁর স্বামী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেছেন অন্যপারে।

কে এই লায়লা কবির ?

সংক্ষেপে বলতে হলে, লায়লা একজন সক্রিয় সমাজকর্মী এবং ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটির সহকারী পরিচালক। লায়লা কবিরের পিতা সুবিখ্যাত হুমায়ুন কবির, কবি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, জন্মসূত্রে মুসলমান। লায়লার মা শান্তিদেবী ব্রাহ্মধর্মের মহিলা।

লায়লা বিয়ে করেছিলেন ক্যাথলিক খ্রিস্টান জর্জ ফার্নাণ্ডেজকে। হুমায়ুন কবিরের ভ্রাতুষ্পুত্র আলতামাস কবির, ভারতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। হুমায়ুন কবিরের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রাক্তন বিচারপতি শুক্লা কবির সিনহা, বিয়ে করেছিলেন আইনজীবী মানস সিনহাকে। লায়লা কবিরের একমাত্র পুত্র শন ফার্নাণ্ডেজ– নিউইয়র্ক শহরে থাকেন– বিয়ে করেছেন জাপানি বৌদ্ধ ধর্মের এক মেয়েকে।

একটি পরিবার এভাবেই সব ধর্মের বাধানিষেধ ভেঙে ক্রমশ আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। হুমায়ুন কবির ছিলেন কেন্দ্রের যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব এবং দিল্লিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান। জওহরলাল নেহেরু এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি দুবার ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রীও ছিলেন।

জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ান নেতা। যখন সর্বভারতীয় রেলওয়েম্যানস ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন, তখন তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট ছিল ১৯৭৪ সালের সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘট, যেখানে সমগ্র দেশ স্তব্ধ হয়ে যায়। পাঁচ দশক আগে রেল শ্রমিকদের ক্ষোভের ফলস্বরূপ এই ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল।

জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ছিলেন রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক, যিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একজন প্রবীণ সমাজতান্ত্রিক, তিনি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে লোকসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭১সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডক্রশ সোসাইটির পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন লায়লা। রাজনীতিবিদ জর্জ সেইসময় ত্রাণশিবিরে আসতেন। একদিন কলকাতা থেকে দিল্লি ফেরার সময় তাঁদের যোগাযোগ, সেটাই গড়ালো বিয়েতে।

ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করার একদিন আগে (২৪ জুন ১৯৭৫) জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ওড়িশার বেরহামপুর শহরের কাছে গোপালপুর-অন-সি সৈকতে তাঁর শ্বশুর হুমায়ুন কবিরের বাড়িতে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন । জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিবার ছেড়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান। লায়লা তাঁদের নবজাতক পুত্রকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে ঘুরে ঘুরে ভারতে জারি করা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারের নেতৃত্ব দেন। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের ২২ মাস পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

রাজনীতির প্রখর আবর্তে জর্জ ক্রমশ সরে যেতে থাকেন সংসার ও স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে। লায়লা কবির নিজেই বলেছেন – 'জর্জ কি পারিবারিক মানুষ ছিলেন? না! তিনি ৯৫% জনসাধারণের একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর আগ্রহ এবং স্বপ্নকে যা উত্তেজিত এবং প্রজ্বলিত করেছিল তা হল সামাজিক সমস্যা, যা সমাজের সকল স্তর থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে দরিদ্রদের কাছ থেকে। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা, প্রতিটি রাত জেগে কাজ করতেন, অন্যথায় তিনি অস্থিরভাবে চলাফেরা করতেন। তিনি তিব্বত এবং বার্মার কারণগুলিকে বিরল আবেগ এবং আন্তরিকতার সাথে সমর্থন করেছিলেন। সত্য বলতে, তিনি সেই সময়ের জ্বলন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সাথে বিবাহিত ছিলেন– আমি তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি মেনে নিয়েছিলাম যখন তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন । আমরা খুব কমই একসাথে থাকতাম, বিশেষ করে যখন তিনি সরকারের সদস্য হয়ে উঠলেন, তাই আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে প্রস্তাব করেছিলাম যে আমরা তাঁর স্বাধীনতা পূর্ণ করার জন্য আলাদা জীবনযাপন করব। জর্জ দ্বিধা করলেন, কিন্তু তারপর রাজি হলেন। এটি একটি বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু, অতীতের দিকে তাকালে, এটি ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।'

অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে যখন বিজেপি মন্ত্রীসভা গঠন করে, তখন জর্জ ফার্নাণ্ডেজ মন্ত্রী হয়েছিলেন। লায়লা কবীর বলেছিলেন, জর্জের বিজেপি-সংযোগে তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। জর্জ শেষজীবনে আবার ফিরে এলেন লায়লা কবীরের কাছে, তখন জর্জ খুব অসুস্থ। এ্যালজাইমার ও পার্কিনসন্স অসুখে কাতর। স্মৃতিবিভ্রম হচ্ছে।

জয়া জেটলির বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন জর্জ। তাই জর্জ যখন ফিরে এলেন নিজের স্ত্রীর কাছে, জয়া জেটলি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন যাতে জর্জের দেখাশোনার ভার তিনি পান। কিন্তু কোর্ট সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

লায়লা নিজের মনপ্রাণ দিয়ে অসুস্থ জর্জের সেবা ও শুশ্রূষা করে গেছেন। লায়লা বলেছেন, '২০০০ সালে জর্জ ফার্নাণ্ডেজ পুত্র শনের এমবিএ স্নাতক অনুষ্ঠানে শিকাগোতে গেছিলেন এবং ২০০২ সালে শনের বিয়েতে কিয়োটোতে যান। ২০০৯ সালে তিনি তার নাতি কেনকে চিনতে এবং আদর করতে পেরেছিলেন, যার বয়স তখন মাত্র ৯ মাস। পরে তাঁর স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়।'...

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক এবং নেহেরু সরকারের মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের কন্যা, লায়লা কবির সেই প্রাথমিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং ভারতের প্রতিশ্রুতির প্রতিমূর্তি তুলে ধরেছিলেন।

ফার্নাণ্ডেজ অসুস্থ থাকাকালীন এবং লায়লার যত্ন ও পরিচর্যার মধ্যে থাকাকালীন, লায়লা একবার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছিলেন যে তিনি কোনও মুসলিম বা হিন্দুকে বিয়ে না করার সংকল্প করেছিলেন। 'দেশভাগের স্মৃতি তখনও কাঁচা ছিল। আমার বাবা মুসলিম ছিলেন এবং আমার মা ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। আমি এটাও ছিলাম না, ওটাও ছিলাম না।' ফার্নাণ্ডেজ যাজক হওয়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। লায়লার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়, তিনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন যিনি যীশুকে একজন 'উগ্র সমাজতান্ত্রিকক্ষ্ম হিসেবে দেখেছিলেন। তাই মুসলিম পিতা ও ব্রাহ্ম মায়ের কন্যা লায়লা, একজন খ্রিস্টানকে বিয়ে করার পরে, তাঁর জীবনের সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্যেও দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সত্তাকে হৃদয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ডি.এ.মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সারা দেশের কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জয়

শ্যামল কুমার মিত্র

অবশেষে ১৯ তম শুনানীর দিনে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং মাননীয় বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ গত ১৬ই মে যে অন্তবর্তী নির্দেশ দিয়েছেন তা এক কথায় ঐতিহাসিক।

প্রথমেই বলে প্রয়োজন (১) মামলার নাম 'Confederation Of State Govt. Employees & ors--vs--State Of W.B.&ors'

(২)২০১৬ সালে Confederation প্রথম স্যাটে মামলা করে।

(৩) মামলায় প্রথম দিন থেকেই সঙ্গে ছিলেন ইউনিটি ফোরাম।

(৪)গত ১৩.০৪.২০২২ সালে মামলায় যুক্ত হন কর্মচারী পরিষদ।

(৫) এই ৩ টি সংগঠন বাদে অন্য কোন সংগঠন/মঞ্চ এই মামলায় যুক্ত নন।

(৬) এই মামলায় কর্মীপক্ষে যে আইনজীবীরা আছেন---বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিম, গোপা বিশ্বাস, রইফ রউম,আলি আসগর রহিম,শেখর কুমার(এ.ও.আর.),তানিয়া তামান্না(এঁনারা কনফেডারেশনের আইনজীবী), প্রবীর চাটার্জী,করুণা নন্দী(ইউনিটি ফোরাম),গুড্ডু সিং, পি.এস.পাটোয়ালিয়া(কর্মচারী পরিষদ)।

(৭) এই মামলায় কখনো কোন গুরু কৃষ্ণকুমার,নচিকেতা যোশী,হরিশ সালভে কর্মীপক্ষের আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করেন নি। দুর্ভাগ্য এই ৩ আইনজীবির নাম ব্যবহার করে কর্মচারী আন্দোলনে জনৈক 'স্বঘোষিত অবতার' সংবাদ মাধ্যম এবং কর্মচারী সমাজকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন । সম্ভবত ঐ 'স্বঘোষিত অবতার' মার্ক টোয়েনের একটি উক্তিকে বড় বেশি বিশ্বাস করেন,মার্ক টোয়েন বলেছিলেন,'মানুষকে বোকা বানানো সহজ। কিন্তু বোঝানো কঠিন যে তাঁকে বোকা বানানো হয়েছে। 'কিন্তু অন্যের কৃতিত্ব নিজের কৃতিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার মোহে কেউ কেউ বিস্মৃত হন , সচেতন ও শিক্ষিত কর্মীসমাজ সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার দেখে অচিরেই বুঝতে পারবেন এই মামলার সঙ্গে ঐ 'স্বঘোষিত অবতার'এর অতি দূর কোন সংযোগ/ সম্পর্ক নেই। ফলে উনি নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা চিরতরে হারাবেন। যে সব সংবাদ মাধ্যম/ ইউটিউব চ্যানেল সব জেনেও ঐ 'স্বঘোষিত অবতার'কে প্রোমোট করার 'আরোপিত দায়' নিয়েছেন,তাঁরাও তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছেন।

এবার মুল প্রসঙ্গে আসি। আমি সুপ্রিম নির্দেশের মূল অংশগুলি হুবহু তুলে ধরছি, এই অন্তবর্তী নির্দেশ থেকে স্পষ্ট।

(১) নির্দেশটি গত২০.০৫.২০২২এর কলকাতা হাইকোর্টের রায় এবং গত ২২.০৯.২০২২ এর স্যাটের রায়ের প্রেক্ষিতে (in terms of) দেওয়া হয়েছে যে ২টি রায়ে All India Consumar Price Index অনুসারে ডি.এ.দিতে বলা হয়েছে। বকেয়া ডি.এ.র হিসাব হবে A.I.C.P.I. অনুসারে। অর্থাৎ প.ব. রাজ্যকর্মীদের A.I.C.P.I. অনুসারে ডি.এ. প্রদান সুপ্রিম মান্যতা পেল। এটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী এবং আক্ষরিক অর্থে,ঐতিহাসিক।

(২) আর্থিক সঙ্কট,আদালতে মামলা বিচারাধীন, ডি.এ.'মৌলিক অধিকার' কিনা- এসব অজুহাতে বকেয়া ডি.এ.র ১০০% আটকে রাখা যাবে না,কর্মীদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হবে সরকারকে।

(৩) "D.A is a legally enforceable right of the employees." --কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় (৩১.০৮.২০১৮) নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, এটি আর পরিবর্তন হচ্ছে না, শুধুমাত্র ডি.এ.'মৌলিক অধিকার' (fundamental right) কিনা ---এটি সুপ্রিম কোর্টের বিবেচ্য,এটিই বিচারাধীন। আমরা যদি সব থেকে নেতিবাচক সম্ভাবনার কথা ভাবি,তা হলেও ডি.এ.'মৌলিক অধিকার'নয় -- এটুকু আমাদের মেনে নিতে হতে পারে। কিন্তু "D.A. is a legally enforceable right of the employees."-- এই 'অধিকার' আর কোন সরকার কেড়ে নিতে পারবেন না। এই প্রথম সারা ভারতে ডি.এ.এমন সুনির্দিষ্ট আইনি অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল। এই নির্দেশ শুধুমাত্র প. বঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী,পঞ্চায়েত/পুরসভাসহ সমস্ত রাজ্য কর্মীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের 'ডি.এ./ডি.আর.এর আইনি অধিকার' প্রতিষ্ঠা করল এমন নয়,সারা ভারতে ভবিষ্যতে কোন রাজ্য সরকার/কেন্দ্র সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মীদের এ.আই.সি.পি.আই.মেনে ডি.এ.দিতে অস্বীকার করলে,সংশ্লিষ্ট কর্মীরা এই রায় দেখিয়ে আদালত

থেকে তাঁদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে পারবেন। তাই এই অন্তবর্তী নির্দেশ সারা ভারতের কর্মচারী আন্দোলনে অবশ্যই এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসাবে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, এই সরকার আদালতের নির্দেশ মানবে তো ? আমরা প্রস্তুত হয়ে বসে আছি, ৬ সপ্তাহের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর না করলে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার জন্য। সেক্ষেত্রে কি হতে পারে ? কয়েকটি উদাহরন দিই।

(১) ২০০৩ সালে বিহার সরকারের মুখ্যসচিব সুপ্রিম নির্দেশে জেলে যান, সুপ্রিম রায় কার্যকর না করার জন্য ক্ষমা চেয়ে,নির্দেশ কার্যকর করে,১০হাজার টাকার বন্ডে জেলমুক্ত হন।

(২)২০২১ সালে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের নির্দেশে ৬ জন শীর্ষ আই.এ.এস.অফিসারের শাস্তির ব্যবস্থা হয়,নির্দেশ কার্যকর করার পর শাস্তি মুকুব হয়।

(৩)২০২৩ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশে এক অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং দু'জন অফিসার জেলে যান, নির্দেশ কার্যকর করার পর মুক্তি মেলে।

(৪) এ রাজ্যে জ্যোতি বসুর আমলে জুডিশিয়াল অফিসারদের সুপ্রিম নির্দেশ অনুসারে বকেয়া প্রাপ্য না মেটানোয় এ রাজ্যের মুখ্যসচিব .এবং অর্থসচিবকে ২টি বিকল্পের ১ টি বেছে নিতে বলেন সুপ্রিম কোর্ট। (ক) জেলে যাওয়া এবং (খ) অবিলম্বে প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া। সরকার দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নিয়ে শীর্ষ আধিকারিকদের জেল যাত্রা আটকান।

এবারেও সুপ্রিম নির্দেশ অনুসারে বকেয়া ডি.এ./ডি.আর. ৬ সপ্তাহের মধ্যে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে না পাঠালে, আদালত অবমাননার মামলায় মুখ্যসচিবও অর্থসচিবের ক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে তা না জানার মত নির্বোধ যে শীর্ষ আধিকারিকরা নন তা সহজবোধ্য। এই সব সর্বোচ্চ স্তরের অফিসাররা ততক্ষন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর অন্যায়,কর্মী ও জনবিরোধি নির্দেশ রূপায়ণ করেন, স্তাবকতা করেন,তৃণমূল ক্যাডারের ভূমিকা পালন করেন, যতক্ষন পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিগত লাভের হিসাবটা ঠিক থাকে,কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষতির আশঙ্খা দেখা দেয়,তখন তারা 'নিরপেক্ষ' হয়ে 'সাংবিধানিক দায়িত্ব'পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই অহেতুক আশঙ্কার কোনও প্রশ্ন নেই,সরকার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই সুপ্রিম নির্দেশ কার্যকর করবেন। কত সময়ের বকেয়া ডি.এ.? আমাদের পিটিশন অনুসারে জুলাই ২০০৯ থেকে জানুয়ারি,২০১৯ পর্যন্ত। কিন্তু সুপ্রিম নির্দেশ হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ২০.০৫.২০২২ এবং স্যাটের ২২.০৯.২০২২ এর রায়ের প্রেক্ষিতে (in terms of) গত ১৬.০৫.২০২৫ এ। তাই আমাদের আইনজীবিদের মতে বকেয়া দিতে হবে জুলাই,২০০৯ থেকে ২১.০৯.২০২২ পর্যন্ত যেহেতু এ.আই.সি.পি.আই.মেনে ডি.এ. দেওয়ার অধিকার স্বীকৃতি পেল সুপ্রিম কোর্টে, তাই বর্তমান ৩৭% ডি.এ.সহ ভবিষ্যতে সমস্ত ডি.এ.সরকারকে এ.আই.সি.পি.আই.অনুসারে দিতে হবে বলে আমাদের অভিমত। আগামী ০৪.০৮.২০২৫এর সুপ্রিম শুনানীতে বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে বলে আমাদের ধারনা। মামলার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন বাদে কোনও সংগঠন তাদের লিখিত দাবিসনদে 'রোপা--২০০৯'এর বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি করেননি। অর্থাৎ মামলার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন বাদে সমস্ত সংগঠন এই দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন,মনে করেছিলেন এই দাবি আদায়যোগ্য বা প্রাসঙ্গিক নয়। দীর্ঘ ১০ বছর মামলা চলাকালীন সময়ে আমরা শুনেছি,'আদালতে কিস্যু হবে না,কোর্টে মামলা করে দাবি আদায় হয় না। একমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় সম্ভব।' আমরা প্রথম থেকেই বলে এসেছি,'আন্দোলনের পাশাপাশি কৌশলগত অবস্থান হিসাবে আইনের সাহায্য নেওয়াও দরকার'। ২০১৬ সালে আমরা শাসক দলের কর্মী সংগঠন বাদে সমস্ত কর্মী সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার প্রক্রিয়া চালিয়েছিলাম।ইউনিটি ফোরাম নামে একটি ছোট সংগঠন বাদে কোন সংগঠন মামলায় যুক্ত হননি। আমরা সরকারি কর্মী সংগঠন হওয়ায় স্যাটে মামলা করি। কিন্তু একই দাবিতে শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী সংগঠন গুলি হাইকোর্টে পৃথকভাবে মামলা করতেই পারতেন,করেননি। মামলায় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে যুক্ত করার প্রয়োজনে আমরা সংগঠনগুলির কাছে Added Party হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম,কোন সংগঠন রাজি হন নি।

স্বপন দে কে মনে রাখবো

তাই অর্থ দপ্তরের (প্রয়াত) সহকর্মী স্বপন দে মামলায় Added Party হবার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। অথচ মামলায় একজন ব্যক্তি কর্মচারীর যুক্ত হওয়া সংশ্লিষ্ট কর্মীর পক্ষে যথেষ্ট আতঙ্কজনক ছিল , রাজরোষের কারণে। আমরা তাঁর গৃহবধূ স্ত্রীর কাছে জানতে যাই, তাঁর স্বামীর মামলায় যুক্ত হবার ক্ষেত্রে তাঁর সম্মতি আছে কী না ? স্বপন বাবুর স্ত্রী স্বামীকে পূর্ণ সমর্থন জানান । তাঁরই আইনজীবী হন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য । তাঁকে Added Party করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রবল বাঁধা দেয় জ্জ কিন্তু High Court এই আপত্তি গ্রাহ্য করেনি।

রমাপ্রসাদ বাবু (কলকাতা হাইকৌর্টের একজন তৃণমূল সমর্থক আইনজীবি) হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ডি.এ.কেন্দ্র/রাজ্য কোন সরকারি কর্মীকে না দেওয়ার দাবিতে 'জনস্বার্থ মামলা' করেন। স্বয়ং সর্দার আমজাদ আলি বলেছিলেন, 'রমা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে কেসটা ফাইল করেছে। 'প্রত্যাশিত ছিল, এই মামলায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি,কেন্দ্র/রাজ্য কর্মী সংগঠন গুলি এই মামলায় যুক্ত হয়ে রমাপ্রসাদবাবুর বক্তব্যের বিরোধিতা করবেন। কেউ এগিয়ে আসেন নি। আমরা বর্তমান মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ডি.এ.প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কোনও মামলা করতে পারব না আইনি বাধ্যবাধকতায়। অথচ 'রোপা-২০১৯এ 'ডি.এ.'শধটাই নেই। অবিলম্বে 'রোপা-২০১৯'এ এ.আই.সি.পি.আই মেনে ডি.এ.র সংস্থান রাখার দাবিতে মামলা করা প্রয়োজন। আমরা বারবার সংগঠনগুলিকে এই মামলা করার জন্য

আবেদন করেছি। কোনও সংগঠন এগিয়ে আসেন নি। বস্তুত যে দিন সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের রায় কার্যকর করতে হলে ৩,১৯,০০০ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে ডি.এ./ডি.আর দিতে হবে,সেদিন থেকে সরকারি কর্মী বাদে অন্যান্য রাজ্যকর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে তারা বাদ পড়ে যাচ্ছেন। এই আতঙ্কবোধ থেকেই বছর তিনেক আগে মঞ্চ গঠন করে ডি.এ.র দাবিতে আন্দোলন শুরু। অথচ এরা দেখেন নি সরকার ঐ একই নথিতে 'গ্রান্ট- ইন-এইড'হেডে বেতন প্রাপকদের ডি.এ./ডি.আর. বাবদ খরচের তথ্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সরকারই সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী সহ অন্যান্য রাজ্য কর্মীদেরও মামলার আওতায় রেখেছেন। বস্তুত সমস্ত কর্মী সংগঠন এই ডি.এ.মামলা সম্পর্কে সম্পুর্ন উদাসীন ছিলেন। অথচ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম,মামলায় দীর্ঘসূত্রতা সহ অনাবশ্যক জটিলতা আসবে জেনেও , গত২৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদন হল। সৌভাগ্য যে সুপ্রিম কোর্ট পত্রপাঠ এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। কোন মামলায় হারেন না এমন আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন 'স্বঘোষিত অবতার ''রোপা-২০১৯'এ ডি.এ.অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মামলা করছেন না কেন? নজিরবিহীনভাবে মামলার কোন অংশ না হয়েও, হরিশ সালভে সহ প্রথিতযশা আইনজীবিদের নাম ব্যবহার করে,মামলায় জয়ের ১০০% কৃতিত্ব দাবি করে প্রচার চলছে। এবারও সমস্ত সংগঠন এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে মৌন।

শাসক দল সমর্থক কর্মী সংগঠন মামলার প্রথম দিন থেকেই এই মামলার বিরুদ্ধে , এমন কি প্রশাসনিক ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করে মামলার জন্য রসদ সংগ্রহে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাধা দিয়ে এসেছেন এবং এখনও একইভাবে সক্রিয়। আশা করি তাঁরা এই মামলার সুফল প্রত্যাখ্যান করবেন।

আমরা বা ইউনিটি ফোরাম এই জয়ের কৃতিত্ব দাবি করি না। এই জয় সামগ্রিক ভাবে কর্মীসমাজের জয়। পরিশেষে একটা বিষয় বলি। আমাদের সংগঠন বর্তমানে প্রবল অর্থ সঙ্কটে, বেশ কিছু দেনাও আছে। আপনাদের কাছে সবিনয় আবেদন দয়া করে মামলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে আমাদের সংগঠনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (Confedrration Of State Govt. Employees– A/C No.085505007776 – IFS code 0085520– P.NB.– Lalbazar Br) আমাদের ফোন নম্বর- মলয় মুখোপাধ্যায় 9432338004/ 9875315736SW/AV/ শ্যামল কুমার মিত্র 9163139444SW/A)। সর্বস্তরের কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি,কথা দিচ্ছি শেষ জয়টা আপনাদের উপহার দিতে আমরা আপ্রান চেষ্টা করব।

লেখক শ্যামল কুমার মিত্র, সভাপতি, কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ,প.বঙ্গ (আই.এন.টি.ইউ.সি.)

পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি কিন্তু মাথাপিছু আয়ে স্থান একশো তেতাল্লিশতম

অমিতাভ সিংহ

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। এর সভাপতি মনোনীত করেছিলেন জওহরলাল নেহেরুকে। তাঁদের কাজ ছিল দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ ও কার্যকরী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করে দেশের মানুষের হাতে কাজ তুলে দেওয়া, একই সঙ্গে তাদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। তাঁরা সুযোগ পেলে কখনও দেশের মানুষের সামনে মিথ্যা ঢাক পেটাতেন এমন ঘটনা মনে পড়ে না। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসে কমিশন তুলে চালু করলেন নীতি আয়োগ।

বিগত দুই দশকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কতজন গভর্নর তাঁদের দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছেন তার হিসাব তো আমাদের জানা। অরবিন্দ সুব্রাহ্মনিয়াম , বিরল আচার্য , উর্জিত প্যাটেল আরও কত নাম।খোদ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের অর্থনীতিবিদ স্বামী পরাকলা প্রভাকর তো মোদীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করছেন বহুদিন ধরেই। সেই নীতি আয়োগের সিইই বি ভি আর সুব্রাহ্মনিয়াম হঠাৎ ঢাক পেটালেন যে আই এম এফের তথ্য অনুযায়ী ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হয়েছে জাপানকে পেছনে ফেলে। কারণ জাপানের অর্থনীতি যেখানে ৪১৮৫ ট্রিলিয়ন ডলারে আটকে আছে সেখানে ভারতের অর্থনীতির পরিমান অল্প বেশী অর্থাৎ ৪১৮৬ ট্রিলিয়ন ডলার। এক ট্রিলিয়ন মানে এক লক্ষ কোটি। পুরোটারই উৎস আইএমএফের একটা অনুমান ভিত্তিক সমীক্ষা যার প্রকৃত তথ্য আসতে আরও বছর দুয়েক সময় লাগবে। এরই মধ্যে বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে কোন পরিবর্তন হবে না তা কে বলতে পারে? ইতিমধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ ঘোষণা করে সংকেত দিয়ে রেখেছেন। উল্টোদিকে রাশিয়া ইউক্রেন বা ইজরায়েল প্যালেস্তাইন সংঘর্ষ বা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তার ওপরও কিছুটা নির্ভর করবে।

জিডিপি দিয়ে কোনও দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বিচার করা কতটা নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহ বহুকাল ধরেই। জিডিপি সূচকের জনক সাইমন কুজনেটসের মতে "The welfare of the nation can scarcely be inferred from a measure of national income". তাই এক্ষেত্রে জিডিপির সঙ্গে যুক্ত পার ক্যাপিটা আয়ের প্রশ্নটি অবধারিতভাবে উঠে আসছে। অর্থাৎ একজন মানুষের আয় কত? "GDP per capita is a key indicator that measures the average economic output or income per person in a

country. " যেহেতু ভারতের সঙ্গে তুলনাটা হচ্ছে জাপানের তাই কয়েকটা তথ্য একটু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। ভারতের আয়তন ৩,২৯,০০,০০০ বর্গ কিমি সেখানে জাপানের আয়তন ৩,৭৭,০০০ বর্গ কিমি। অর্থাৎ ৮৭ গুণ বেশি। ভারতের জনসংখ্যা ১৪৩ কোটি, সেখানে জাপানের জনসংখ্যা ১৩ কোটির একটু কম।এর অর্থ ভারতের জনসংখ্যা জাপানের তুলনায় ১১ গুণ বেশি।আমরা জানি কোন দেশের জনসংখ্যা ও ভৌগলিক আয়তন বেশি হলে স্বাভাবিকভাবে তার মোট জিডিপির পরিমাণ বেশি হয়। এটাই অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম। একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝানো যেতে পারে। ধরুন এক পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী মিলে মোট এক লক্ষ টাকা আয় করেন। অপর একটি পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তান মিলে ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা আয় করেন। তাহলে মোট আয়ের নিরিখে দ্বিতীয় পরিবারের মোট আয় বেশী প্রথম পরিবারের তুলনায়। কিন্তু প্রথম পরিবারের মাথাপিছু আয় যেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা, সেখানে দ্বিতীয় পরিবারের মাথাপিছু আয় ত্রিশ হাজার টাকা। তাহলে কোন পরিবার বেশি ভালভাবে জীবন কাটাতে পারবেন ?

ফিরে আসি জাপানের সঙ্গে তুলনায়। ভারতের মাথাপিছু গড় আয় ২,৪৫,২৯৩ টাকা বছরে। জাপানের তা ২৮,৯২,৪১৩ যা ভারতের চেয়ে ১২ গুণ বেশী। তাহলে কিভাবে আমরা জাপানকে পেছনে ফেললাম। মাথাপিছু আয়ে ভারতের অবস্থা বিশ্বে ১৪৩ তম স্থানে আছে। এতদূর না গিয়ে ব্রিকস ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যদি তুলনা করি তাহলে সেখানে ভারত সর্বশেষ স্থানে অর্থাৎ চিন(১৩৬৯০), রাশিয়া(১৪৯৫৩), ব্রাজিল (১০২৯৬) এমনকি দক্ষিন আফ্রিকা (৬৩৭৭) এর পরে। এরপরেও বলতে হবে ভারত বিশ্বের প্রথম চারটি অর্থনীতির একটি ?

অক্সফাম ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সমীক্ষক সংস্থাগুলির সমীক্ষায় যেটা উঠে এসেছে তা হল দেশের ওপরের তলার ১% মানুষের হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশ সম্পদ। আর সবশেষের ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে দেশের মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ। ওপরের ১০ শতাংশ আয় করে দেশের ৫৭ শতাংশ জাতীয় আয়। ওপরের ১ শতাংশকে সরিয়ে নিলে মাথাপিছু আয় নেমে আসবে ১৬৭০ মার্কিন ডলার। আবার যদি ওপরের ৫ শতাংশের হাতে থাকা সম্পদ বাদ দিই তাহলে দেশের ৯৫ শতাংশের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় বছরে ১১৩৮ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বছরে এক লক্ষ টাকার মত। ঠিক এইখানেই দেশের বেশীরভাগ মানুষ রয়েছে। তাও এটা সম্ভব হয়েছে ইউপিএ সরকারের আমলে তৈরী খাদ্য সুরক্ষা আইনবলে দেশের আশি কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেয় বলেই। আসলে এই আয় বৈষম্য আমাদের আসল অর্থনৈতিক সমস্যা।

বর্তমানে আমরা যে ভারতে বাস করছি তা হল আয়বৈষম্যের তীব্রতা বৃদ্ধির ভারত। নেহেরু ইন্দিরা যুগে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' এর অর্থনীতি। বুক বাজিয়ে বলার মত গ্রোথ না থাকলেও দেশের ওপরের তলার মানুষের সঙ্গে নীচুতলার মানুষের আয়বৈষম্যের তীব্রতা অনেক কম ছিল। আসলে তখন নেহেরুজি ব্যাপক বড় শিল্প ও রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প গড়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি (এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন) করেছিলেন। এর ফলে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। তারা পে স্কেল, ডিএ, মেডিকেল বেনিফিট, হাউস রেন্ট অ্যালুয়েন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড,গ্রাচুইটির সুবিধা পেত। তাছাড়া তারা ও সমাজের তুলনায় নীচুতলার মানুষেরা সরকারী স্কুলে বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ, রেশন ব্যবস্থা, সস্তার জ্বালানী, সস্তার পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদির সুফল ভোগ করেছিলেন।

সেইসময় ভারতে পারিবারিক গড় আয় বেড়েছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ। এটা ছিল মূল্যবৃদ্ধি বাদ দিয়ে প্রকৃত আয়বৃদ্ধি। টমাস পিকোটি ও লুকাস চ্যানসেলের গবেষণায় জানা গেছে যে সর্বনিম্ন আয় বিশিষ্ট ৫০ শতাংশ পরিবারের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৮৭ শতাংশ এবং মাঝের ৪০ শতাংশ পরিবারের তা ছিল ৭৪ শতাংশ। গড়ের অনেকটা নীচে ছিল সর্বোচ্চ আয়ের ১০ শতাংশ পরিবারের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার। সমাজের একেবারে ওপরের তলায় থাকা মুষ্টিমেয় পরিবারের আয় কমে গিয়েছিল। আয় বৈষম্য মাপার সহজ ও আধুনিক সূচক হল জিনি সূচক।সেই সূচক অনুযায়ী দেশের আয় বৈষম্যের মান ১৯৫১ সালের মান ০.৪৬৩ থেকে কমে হয়েছিল ০.৩৯৬। এই মান যত শূণ্যের কাছাকাছি হবে তত আয় বৈষম্য কম বলে ধরা হয়।

মোদী আমলে ভারতে প্রকৃত উপার্জন একেবারেই বাড়ে নি।কর্মহীনতা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ। কৃষি ভয়াবহ সঙ্কটে। সরকার নতুন কৃষি আইন চালু করতে গিয়ে সারা দেশ জুড়ে কৃষকেরা যেভাবে পথে নেমেছিল তা ঐতিহাসিক। দেশে গণতন্ত্র নিধন প্রতিদিনই চলছে। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রশ্ন করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হল। তিনি জামিন পেলেও বিচারপতিদের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্বেগ ধরায় বৈকি। প্রাণভয়ে বা অবসরের পর বিশেষ সুবিধালাভের জন্য সরকারের তোষামোদির বহর দেখে বিচারবিভাগের ওপর আস্থা রাখা অনেকসময় সমস্যা হয়ে উঠছে।

একটা দেশের মানুষ কতটা সুখে আছে তা বোঝা যায় বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১২৭ টি দেশের মধ্যে ১০৭ তম। পাঁচ বছরের আগেই মৃত্যুর হার যে কোন উন্নতিশীল দেশের মধ্যে বেশী।পুষ্টির অভাবে শিশুদের উচ্চতা ও ওজন অনেক কম। মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা ১৯৩ দেশের মধ্যে ১৩৪ তম স্থানে। যেখানে বাংলাদেশ ১৩০ তম ও শ্রীলংকা ৭৩ তম স্থানে। ভারতের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা,জীবনযাপনের মানে আমরা অনেক পেছিয়ে। গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে আমরা ১৬৩ দেশের মধ্যে ১৩৫ তম স্থানে। হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে ১২৬ তম,লিঙ্গ বৈষম্যে ১২২ তম,দুর্নীতি সূচকে ৮৫ তম,স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও গুণমান সূচকে ৬৮ তম,সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৪২ তম,রাস্তার মান সংক্রান্ত সূচকে ৪৫ তম। কি বলবেন এসব দিয়ে কি হবে?

দেশের মোট বাজেটের ১.২% স্বাস্থ্যে,শিক্ষায় ৩%, গবেষণায় ০.৭%ব্যয় হয় যে দেশে এগোবে কি করে? ইউপিএ আমলে

কর্পোরেট কর বেশী করা হয়েছিল।যার ফলে শিল্পপতি ও ধনীব্যক্তিদের বেশী কর দিতে হত। ফলে তাদের দেওয়া অর্থ দিয়ে সমাজের দূর্বল শ্রেনীর মানুষের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। মোদী সরকার গত একদশকে কর্পোরেট কর কমিয়ে দিয়েছে। উচ্চ আয়ের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের করও কমানো হয়েছে। যার ফলে তারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। করোনাকালে দেশের মানুষের আয় অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল আদানী অম্বানীদের আয় বিপুলভাবে বহুগুণ বেড়েছে। ভুল জিএসটি চালু করে দেশের প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা আরও বাড়িয়েছে। উচ্চতলার মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করেন ও তার জন্য যে পরিমান জিএসটি সরকারকে দেন সেই একই পরিমান পরোক্ষ কর বা জিএসটি একজন প্রান্তিক স্তরে থাকা মানুষও সরকারকে দেন। মনে রাখতে হবে একজন ভিখারীও সরকারকে কর দেন।আমাদের দেশে কর জিডিপি অনুপাত মোটে ১৬/১৭ শতাংশ। এটা না বাড়লে জনকল্যাণকর কাজে কিভাবে বাজেটবরাদ্দ বাড়বে কি করে? যদিও পরোক্ষ করের হার যথেষ্ট বেশী। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর বাড়াতে হবে।

বৈষম্য কমাতে মৌলিক গুণমান আছে এমন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা বড় হয়ে তারা ভাল আয়ের রাস্তা খুঁজে পায়। ধনীরা শিক্ষা কিনতে পারে,তাদের সন্তানকে ভাল স্কুল,কলেজ,প্রতিষ্ঠানে পড়াতে বা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে পারে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান বাড়াতে হবে। সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে আরও আধুনিক করে তার বিস্তার করতে হবে। আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে আরও লাভবৃদ্ধির সুযোগ ও ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলিকে বীমাকারীদের ঠকানোর সুযোগ মোদী সরকার করেছে তা প্রত্যাহার করা। লেবার ইন্টেসিভ শিল্পকে গুরুত্ব দিতে হবে ও সেখানে বিনিয়োগ করতে হবে বেশী কাজের সুযোগ তৈরীর জন্য। এর অর্থ সরকারের যে নজর রয়েছে ক্যাপিটাল জেনারেশন করে যে শিল্প করে তার ওপর,সেখান থেকে সরে এসে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করে যে শিল্প তার ওপর বিনিয়োগ বেশী দরকার। দেশে নগরায়নের জন্য মেট্রোলেপমেন্ট ডেভলপমেন্ট অথরিটি তৈরী হয়। একইরকমভাবে মিউনিসিপাল ডেভলপমেন্ট অথরিটি তৈরী হলে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের সুযোগ অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।

রাজীব গান্ধী একবিংশ শতাধীর কথা ভেবে সি ডট বা টেকনলজি মিশনের মাধ্যমে দেশের ছয়টি দিক চিহ্নিত করে সেগুলিকে শক্তিশালী করেছিলেন। যার ফলে ইনফরমেশন টেকনলজিতে আমরা বিশ্বশাসন করতে পারছি।পৃথিবীর বৃহৎ সংস্থাগুলির প্রধান ও মূল চালিকাশক্তির একটা বড় অংশ ভারতীয়রা। আজ বুঝতে হবে উচ্চশিক্ষা ছাড়া একবিংশ শতাধীতে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। তাই আমাদের জাপানকে জিডিপিতে পেছনে ফেলার বিজ্ঞাপন না করে সর্বক্ষেত্রে তাদের সমকক্ষ হওয়ার দিকে নজর দেওয়ার দিলে ভাল হয় না ?

মাই নেম ইজ খান 'নতুন' ভারতে ন্যায়বিচার কোথায় ?

শুভাশিস মজুমদার

সম্প্রতি অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের একটি নিজস্ব মতামতমূলক ফেসবুক পোস্টের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তারের ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সহ এগারো জন শিক্ষাবিদ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এর তীব্র বিরোধিতা করেন।দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে বিপন্ন করার এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে খানের ক্ষ্মঅবৈধক্ষ্ম গ্রেপ্তারের বিষয়ে তাঁরা বলেন, মাহমুদাবাদকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে কারণ তিনি মুসলিম। অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

সোনিপতে অশোকা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশন এবং ছাত্রদের পক্ষ থেকেও এই গ্রেফতারের তীব্র বিরোধিতা করে অধ্যাপক আলী খান মাহমুদাবাদকে অবিলম্বে মুক্ত করার দাবি জানান হয়েছে। এই গ্রেফতারকে অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতার উপর আঘাত হিসাবে ছাত্ররা বর্ণনা করেছে।

হরিয়ানা মহিলা কমিশন এবং বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক যোগেশ জাথেদির দায়ের করা এফআইআরের পর অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আলী খান মাহমুদাবাদের 'অপরাধ' ছিল যে তিনি ভারত-পাক সংঘাতের বিষয়ে সরকারের মিডিয়া প্রচারে কর্নেল সোফিয়া কুরেশির উপস্থিতি নিয়ে দক্ষিণপন্থী ভাষ্যকারদের উচ্চগ্রামে প্রচারকে নিয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেন। ৮, মে, মাহমুদাবাদ ফেসবুকে ইংরেজিতে যা লেখেন তার বঙ্গানুবাদ এই রকম -

'অবশেষে, আমি খুব খুশি যে এত দক্ষিণপন্থী ভাষ্যকার কর্নেল কুরেশিকে প্রশংসা করছেন, তবে সম্ভবত তাঁরা একইভাবে জোরদার দাবি করতে পারেন যে গণপিটুনি, নির্বিচারে বুলডোজার চালানোর শিকার এবং বিজেপির ঘৃণা-প্ররোচনার শিকার অন্যান্যদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে সুরক্ষিত করা হোক। দুই মহিলা সৈন্যের তথ্য উপস্থাপনের দৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বাস্তবেও প্রতিফলিত হতে হবে অন্যথায় এটি কেবল ভণ্ডামি।'

খান কার্যত কর্নেল কুরেশিকে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন এবং ভারতীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে চাইছিলেন। অবশ্যই এটি ছিল তাঁর মোদী সরকারের প্রতি তীব্র ব্যক্তিগত সমালোচনা, কিন্তু এটি কি 'ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে বিপন্ন করে এমন কাজ' বা প্রকৃতপক্ষে, 'কোনও মহিলার শালীনতাকে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে করা মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কাজ' হিসাবে দেখা যেতে পারে? সরকারের প্রতি সমালোচনা, যতই কঠোর হোক না কেন, কখন থেকে

সেটা এতটাই' অপরাধমূলক ' হয়ে উঠেছে যেখানে কেবল একজন গ্রামীণ সরপঞ্চ যিনি বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী, অথবা হরিয়ানা রাজ্য মহিলা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের অভিযোগের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ সমালোচনাকারীকে গ্রেপ্তার করতে হবে?

একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে যখন আলী খান কীভাবে 'একজন মহিলার শালীনতাকে অবমাননা করেছেন ' তা দেখানোর জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন হরিয়ানা রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রধান রেণু ভাটিয়া জবাব দিতে পারছিলেন না। কোন আপত্তিকর বাক্যকে নির্দেশ করে একটি সুসংগত ব্যাখ্যা দিতে তাঁকে বেগ পেতে হচ্ছিল। এটা স্পষ্ট যে হরিয়ানা রাজ্য মহিলা কমিশন, অনেক 'সরকারি' প্রতিষ্ঠানের মতো, অধ্যাপককে নোটিশ পাঠানোর 'সরকারি' নির্দেশে সক্রিয় হয়ে পড়েছিল। হরিয়ানা পুলিশের সহযোগিতায়, স্পষ্টতই কোনও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়নি, এমনকি কোনও ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা হয়নি বলে অভিযোগ।

এই মামলাটি বেশ কিছু উদ্বেগজনক প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রথমটি হল বাকস্বাধীনতা রোধ করার জন্য ক্ষমতার নির্লজ্জ অপব্যবহার। এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রায় প্রতিটি বিজেপি সরকার, তা রাজ্যে হোক বা কেন্দ্রে, বিভিন্ন দলের, ভিন্নমত পোষণকারীদের কণ্ঠস্বর দমন করার জন্য তার কর্তৃত্ব এবং পুলিশের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে। এক অর্থে, এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা কুখ্যাত উগান্ডার স্বৈরশাসক ইদি আমিনের উক্তি গ্রহণ করেছে, যিনি একসময় বলেছিলেন, 'বাক স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আমি বাক প্রকাশের পরে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে পারি না।'

দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রদ্রোহ আইনগুলিকে 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যেকোনো সমালোচনাকে 'জাতীয়তাবিরোধী' কার্যকলাপের সাথে সহজেই তুলনা করা যায় এবং বাকস্বাধীনতা রোধ করার জন্য আইনটিকে কেবল 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করাই হচ্ছে না, এর প্রয়োগ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বাছাই করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। আইনের আওতায় কে আসবে তা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাসীন অভিজাতদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আলী খানের ঘটনাটির তুলনা মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বিজয় শাহের সাথে করুন, যিনি কর্নেল কুরেশির বিরুদ্ধে সবচেয়ে অবমাননাকর, যৌনতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িকভাবে বোঝানো মন্তব্য করেছিলেন। মন্ত্রীকে বরখাস্ত করার বা অন্তত প্রকাশ্যে তাকে তিরস্কার করার পরিবর্তে, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতৃত্ব প্রকারান্তরে মন্ত্রীকে প্রশ্রয় দেয়। মন্ত্রী যখন প্রতীকী ক্ষমা চেয়েছিলেন (সুপ্রিম কোর্ট যা প্রত্যাখ্যান করেছে), তখন কেন্দ্র স্পষ্টতই নীরব ছিল। এর জন্য হাইকোর্টকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিতে হয়। এবং সুপ্রিম কোর্ট এই মন্ত্রীর মন্তব্যকে 'জাতীয় লজ্জা' হিসাবে বর্ণনা করে। মন্ত্রীর মন্তব্যের 'তদন্ত' করার জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ তদন্ত দল (এস আই টি) গঠন করা হলেও, মধ্যপ্রদেশ পুলিশ মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে তৎপর হয়নি, যেমনটি দিল্লিতে আলী খানের ক্ষেত্রে হয়েছিল। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রফেসর আলী খানের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করার পাশাপাশি মন্ত্রী বিজয় শাহের পদত্যাগের দাবি করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আলী খান মামলার মূলে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত এবং অনবদ্য অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপক খানের জীবনবৃত্তান্তের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তিনি একজন ভারতীয় মুসলিম যিনি তার মতামত প্রকাশ করতে ভয় পান না। তিনি প্রাক্তন মাহমুদাবাদ রাজপরিবার থেকে এসেছেন এবং তাঁর দাদু মোহাম্মদ আমির আহমেদ খান, দেশভাগ-পূর্ব মুসলিম লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি তাঁদের পরিবার দান করেন জ্জ বংশ বৃত্তান্ত তাঁকে হিন্দুত্ববাদীদের সহজ লক্ষ্য হতে সাহায্য করেছে। (এখন অবশ্য বিরোধী দলের নেতারা মোদীর সমালোচনা করলে তাঁদের পাকিস্তানের বন্ধু বলে বিজেপি প্রচার করছে।)

এই কারণেই বর্তমান সরকারের একজন স্পষ্টভাষী সমালোচক আলী খান মাহমুদাবাদের নামে এফআইআর দায়ের করে গ্রেফতার করা হয়। আর, বিজয় শাহ আপাত দৃষ্টিতে আইন লঙ্ঘনকারী মন্তব্য করলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়না কোর্টের আদেশ দেওয়া পর্যন্ত। কারণ তিনি সর্বোপরি শাসক দলের একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য। এটাই পার্থক্য এক মামলায় গ্রেপ্তার, অন্য মামলায় ক্ষমা। এটাই 'নতুন' ভারত।

পরবর্তী স্ক্রিপ্ট সুপ্রিম কোর্ট, আলী খান মাহমুদাবাদকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়ার সময়, তার ফেসবুক পোস্টগুলি খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দল (এস আই টি) নিয়োগ করেছে। এস আই টি কী 'তদন্ত' করতে পারে তা স্পষ্ট নয়। যা স্পষ্ট তা হল, দেখা যাচ্ছে,পুলিশের কার্যকলাপ এবং এই বিচার ব্যবস্থার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটাই শাস্তি।

পুরনো লেখা ফিরে পড়া

কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা

সোমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা'য় লেখাটি প্রকাশিত হয়। তিন পর্বে সমাপ্য দীর্ঘ লেখাটির এবার প্রথম পর্ব)

১.

'ধর্ম মানুষকে আফিমের মতো নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখে' সাধারণত এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেই ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসের মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। বস্তুত যদিও এই উক্তিটি থেকেই সাধারণভাবে

মার্কসের ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ সূচিত হয়, পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই উদ্ধৃতিটি ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করে না। মার্কস বলেছেন মানুষ তার কল্পনার স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের সন্ধান করতে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই পায়নি। ভবিন্নাতে সে তার প্রকৃত সত্তা অন্বেষণের জন্য আর আত্মসদৃশ অ-মানবীয় সত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। মানুষই ধর্মের স্রষ্টা, ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করে নি। যেসব মানুষ তাদের স্বরূপ উদ্ভাবন করতে গিয়ে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, অথবা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, ধর্ম তাদেরই এক আত্ম-সংবিৎ, আত্ম-অনুভূতি। মানবজাতি জগৎ-বহির্ভূত কোনো অমূর্ত সত্তা নয়। তার নিজের জগৎ, রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়েই তার অস্তিত্ব, তার জীবন। আর, যেহেতু এই রাষ্ট্র ও এই সমাজই সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অধিষ্ঠিত, এদেরই সৃষ্ট এক বিপরীত বিশ্বচেতনা হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম এই জগতের এক সাধারণ তত্ত্ব, তার জ্ঞানভাণ্ডারের মর্মবস্তু, তার নৈতিক অনুমোদন, বিবেকের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও ভাবগম্ভীর পরিণতি, তার সান্ত্বনা ও সমর্থনের এক বিশ্বজনীন ক্ষেত্রবিশেষ। ধর্ম হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবের এক অতিকাল্পনিক উপলব্ধি মাত্র, যেহেতু এই নিহিত ভাবের কোনো প্রকৃত সত্তাই নেই। সুতরাং ধর্মের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তা পরোক্ষভাবে সেই 'অন্য জগতের' বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ধর্ম যে জগতের আধ্যাত্মিক সৌরভ। ধর্মীয় দুঃখকষ্ট একাধারে বাস্তব দুঃখকষ্টের প্রকাশ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধর্ম নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর সহৃদয়তার কাহিনী, যেন ভৌতিক জীবনের আত্মা।মানুষের জীবনে ধর্ম হচ্ছে আফিম। ধর্মের নেশায় সে আচ্ছন্ন।

প্রকৃত সুখস্থাপনের জন্য ভ্রান্ত ধর্মসুখের অবসান প্রয়োজন। আর এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তির উপায়, যে অবস্থাসাপেক্ষে এ জাতীয় ভ্রান্তির উৎপত্তি সেই অবস্থার অপসারণ। তাই ধর্মেরস মালোচনা প্রাথমিকভাবে যে সব দুঃখদুর্দশার দিব্যজ্যোতি ধর্ম তারই সমালোচনা। ধর্মের সমালোচনা মানুষকে অধ্যাসমুক্ত করে চিন্তা করার, কাজ করার ও বাস্তব অবস্থাকে নির্দিষ্টভাবে গঠন করার সুযোগ দেবে, যার ফলে সে তার নিজের ও প্রকৃত সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তনে সক্ষম হবে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ আত্মপরিক্রমণে অসমর্থ থাকবে, ধর্ম এক অলীক সূর্যের মতো তার চতুর্দিকে আবর্তিত হবে।

লোকোত্তর জগতের অবসানের পর প্রকৃত জগৎ-সত্য প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ইতিহাসের। আর দর্শনের কাজ, মানুষের বিশুদ্ধ আত্মবিযুক্তির মুখোস খুলে যাবার পর তার বিভিন্ন অশুচি রূপের আবরণ উন্মোচন করা। এইভাবেই স্বর্গের সমালোচনা হবে বাস্তব জগতের সমালোচনা, আর ধর্মের সমালোচনা অধিকারের, এবং ঈশ্বরবাদের সমালোচনা রাজনীতির সমালোচনায় পরিণত হবে।

ধর্মের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কস কিন্তু ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি; কারণ সমাজ বিবর্তনের নির্দিষ্ট স্তরে ধর্ম এক বিশেষ চেতনার ও মানসিকতার রূপ। ইতিহাসের প্রতি যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও তার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠা সমাজ-সংগঠন মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বৃত্তি, চেতনা এবং জীবনপ্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। মানবজীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ কয়েকটি অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে জড়িত হয়। এই সম্পর্ক মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। আর, বিভিন্ন উৎপাদন-সম্পর্কের সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা মূল বনিয়াদ। এই বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনৈতিক ইমারৎ বা উপরিতল, এবং সামাজিক চেতনা ও ভাবাদর্শের নির্দিষ্ট রূপগুলিও হয় তদনুরূপ। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, তার সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনশক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত শুরু হয় প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের। প্রচলিত যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্য থেকে উৎপাদন শক্তি সক্রিয় ছিল, সংঘাতটা তারই সঙ্গে। এই সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশের রূপ থেকে উৎপাদনশক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তারপরই আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। আর অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উপরিতলও রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরগুলি বিচার করতে হলে, উৎপাদনের অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির বৈষয়িক রূপান্তরগুলি বিজ্ঞানসুলভ সুক্ষ্মতার সঙ্গে নিরূপণ করা যায় সেগুলি থেকে ভাবাদর্শগত রূপগুলিকে অর্থাৎ রাজনীতিগত, আইনগত, ধর্মগত বা দর্শনগত রূপগুলিকে পৃথক করে দেখতে হবে। এই ভাবাদর্শগত রূপগুলির মাধ্যমেই মানুষ সংঘাত-সচেতন হয়ে ওঠে ও শক্তিপরীক্ষায় তার নিষ্পত্তি করে। কোনো ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে তার উপর যেমন সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যের ধারণা নির্ভর করে না, তেমনি কোনো রূপান্তরের সময়-সীমাকে সে-যুগের স্বকীয় চেতনা দিয়েও বিচার করা যায় না। সেই চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের বিরোধিতা দিয়ে, সামাজিক উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সংঘর্ষ দিয়ে। নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার মধ্যে যতটা উৎপাদনশক্তির স্থান হতে পারে তার সম্পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সেই সামাজিক ব্যবস্থার কখনো অবসান হয় না। পুরনো সমাজে বিদ্যমান বৈষয়িক শর্ত যতক্ষণ পরিপক্ক হয়ে না ওঠে, উন্নততর উৎপাদন-সম্পর্কের আবির্ভাবও সম্ভব নয়। এই অধিকতর উন্নত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপরিতলও অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এবং সেই সঙ্গে উপরিতলের অন্যতম উপাদান বা অংশ হিসাবে ধর্মীয় ভাবাদর্শেরও পরিবর্তন হয়। নতুন ধর্মচিন্তা পুরনো ধর্মের স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ, মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবনের প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস-এক কথায় চেতনা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন অনিবার্য এবং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভাবাদর্শের মূল নিয়ামকশক্তিও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত। যে-নির্দিষ্ট উৎপাদনব্যবস্থায় নিহিত উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মানব- সমাজে

শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-সম্পর্ক এবং তদনুযায়ী বিশেষ ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিকাশ ও অস্তিত্ব, সেই উৎপাদনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্মেরও অবসান হতে বাধ্য। কিন্তু এই পরিবর্তন কেবলমাত্র বস্তুজগতের ক্রমাগত পরিবর্তনসাধনেই সম্ভব; এবং এই পরিবর্তনসাধন করে চলাই মানুষের ধর্ম। এই পরিবর্তন আবার কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে সাধিত হয়। বস্তু, চিন্তা বা মানুষের লব্ধ জ্ঞান সবকিছুই আপেক্ষিকতা বা পরিবর্তনশীলতার পথ ধরে চলেছে আদিমতম যুগ থেকে। এই আপেক্ষিক পরিবর্তনপ্রবাহে যে-সত্য পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়েছে একমাত্র সেই সত্যগুলিই সনাতন ও চরম সত্যরূপে গ্রাহ্য এবং প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি নিয়মের আকারে সেগুলিই বস্তুজগতে কার্যকর। এই নিয়মসমূহই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সারার্থ।

ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যা ও এই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে ধর্মের যে নব নব রূপান্তর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দরকার যে, যে বস্তুজগতে বা চিন্তার রাজ্যে; এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবাদর্শের জগতে; এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় তার প্রকৃত স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি কী; তার মধ্যে কোনো চিরন্তন সত্য আছে কি না, যার ফলে তা সমাজে সর্ব অবস্থাতেই একই রূপে বিদ্যমান থাকতে পারে। অথবা উৎপাদনব্যবস্থ্য ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা দরকার যে, বিবর্তনের কোন স্তরে বা অর্থনৈতিক বিকাশের কোন্ পর্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মীয় চিন্তার উদ্ভব, উৎপাদনব্যবস্থা ভিত্তিক বনিয়াদের পরিবর্তনে ধর্মীয় ভাবাদর্শেরই বা ভূমিকা কতটুকু, বা আদৌ কোনো ভূমিকা আছে কি না।

মানব জীবন ও ভৌতিক জগৎ-সংক্রান্ত সমস্ত জিজ্ঞাসা বিভিন্ন দশা অতিক্রম করার পর একটি প্রশ্নের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় বস্তুজগৎ কোনো আদি অকৃত্রিম শাশ্বত চৈতন্য থেকে উদ্ভুত, না মানুষের চিন্তাধারা বা চৈতন্য বস্তুজগৎ থেকে জন্মলাভ করে; অর্থাৎ চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোনটি আদি? চিন্তা ও সত্তার আন্তঃসম্পর্কের এই প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে

দার্শনিকরা দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় চৈতন্যকে আদি বলেছেন, অতএব কোনো না কোনোভাবে শেষপর্যন্ত জগৎসৃষ্টির কথা মেনেছেন, তাঁরা গঠন করেছেন ভাববাদীর শিবির। আর যাঁরা প্রকৃতিকে আদি মনে করেছেন তাঁরা হলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বস্তুবাদী। ধর্মের প্রসঙ্গে চিন্তা ও সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্ন অন্যরূপে দেখা দিয়েছে ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, না চিরকালই জগতের অস্তিত্ব ছিল? বস্তুবাদ বা জড়বাদ, তা সে যে সম্প্রদায়েরই হোক; তা ব্যতীত যে কোনো দর্শনেই জীব ও জগৎকে ঈশ্বর বা সর্বশক্তিময় ঐশ শক্তিরই সৃষ্টি বা প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বহু আদিকাল থেকে, মানুষ যখন নিজের দেহগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, মানুষের বিশ্বাস হয়েছে যে তার চিন্তা ও সংবেদন তার নিজস্ব দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, অন্য কোনো বিশিষ্ট আত্মার কাজ, যে আত্মা দেহে বাস করে এবং মৃত্যুর সময় দেহ পরিত্যাগ করে। সেই যুগ থেকেই এই আত্মার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে হয়েছে। এই আত্মা যদি দেহ পরিত্যাগের পর বেঁচে থাকে, তাহলে তার আর স্বতন্ত্র মৃত্যুসম্ভাবনা আবিষ্কার করার কোনো কারণ নেই। এইভাবেই ধারণা জন্মাল যে, আত্মা অমর। বিকাশের সেই পর্যায়ে অবশ্য এই অমরত্বের কথাটা মোটেই সান্ত্বনা নয়, এক নিয়তি, আর এই নিয়তির বিরোধিতা করার চেষ্টা বৃথা। ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বরং আত্মার অস্তিত্ব একবার মেনে নেওয়ার পর দেহাবসানে সেই আত্মা নিয়ে কী করা যাবে সে বিষয়ে সাধারণ অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হল ব্যক্তির অমরত্বের ধারণা। এইভাবেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে প্রথম দেবতাদের উদ্ভব। ধর্মের আরও বিকাশের পর্যায়ে এই দেবতারা ক্রমেই অপ্রাকৃত রূপ লাভ করে, এবং শেষপর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক অমূর্তায়ন-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বহু অল্পবিস্তর সীমিত এবং পরস্পরকে সীমাবদ্ধকারী দেবতাদের মধ্য থেকে মানুষের মনে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা জন্মায়। মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, ঈশ্বরবিশ্বাসে জীবনের সব সংকট ও ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তিই জীব ও জগৎকে পরিচালনা করে। সুতরাং এই শক্তির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বা বলিদান করে একে সন্তুষ্ট করতে হয়। এই শক্তিকে বিশ্বাসের দ্বারা জানা যায়, জ্ঞানের দ্বারা নয়। ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস ও তার সন্তোষ বিধানের যে প্রক্রিয়া, সামগ্রিকভাবে তা-ই ধর্ম। আধুনিক যুগে ধর্ম এক উচ্চ পর্যায়ের মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পরিণত হলেও তার একটা প্রাগৈতিহাসিক অন্তর্বস্তু আছে। সমাজ বিকাশের পরবর্তীকালে যাকে আজগুবি বলা হয়ে থাকে, ঐতিহাসিক যুগ তাকে বিদ্যমান অবস্থায় পায়, এবং আত্মসাৎ করে। প্রকৃতি ও মানুষের স্বীয় অস্তিত্বের বিষয়ে ভূতপ্রেত, জাদুশক্তি ইত্যাদি নানাপ্রকার আদিম ও মিথ্যা ধারণার অর্থনৈতিক ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। প্রকৃতি বিষয়ক মিথ্যা ধারণাই বরং অনেকাংশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিম্ন-অর্থনৈতিক বিকাশের কারণ ও পরিপুরক শর্ত হিসাবে কাজ করেছে। এবং যদিও অর্থনৈতিক প্রয়োজন প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল, এইসব আদিম আজগুবি ধারণার মূলে অর্থনৈতিক কারণ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক।

(চলবে)